ইপিল-ইপিলে সাইলিড পোকার আক্রমণ ও ব্যবস্থাপনা

Heteropsylla cubana Crawford (Psyllidae: Hem.)

পোকার পরিচিতি

ইপিল ইপিল গাছের কচি পাতা ও কান্ডেররস শোষণকারী এ পোকার বৈজ্ঞানিক নাম *Heteropsylla cubana*। এটি প্রাণিজগতের Arthropoda পর্বের Hemiptera বর্গের Psyllidae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত এক ধরণের পতঙ্গ যা দেখতে সরু এবং উদরের নিম্নাংশ মাকু আকৃতির। পূর্ণাঙ্গ পোকা সরু দেহবিশিষ্ট এবং প্রায় ১.৫-২.০ মি.মি. লম্বা। দু' জোড়া স্বচ্ছ পাখা দ্বারা দেহের উপর অংশ আবৃত। গায়ের রং সবুজ থেকে কমলা। পূর্ণাঙ্গ পোকা কচি ডগায় ও পাতায় গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো প্রথমে সাদা বর্ণের হয় এবং পরে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ২-৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বা নিম্ফ বের হয়। ৮-৯ দিনের মধ্যে নিম্ফ পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। অক্টোবর- এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

ক্ষতির প্রকৃতি

এ পোকা কচি পাতা ও কান্ডের অগ্রভাগ হতে রস শোষণ করে। আক্রমণের ফলে পাতা হলুদ হয়ে ডগা কুঁকড়ে যায় অথবা শুকিয়ে মরে যায়। ব্যাপক আক্রমণের ফলে চারা সম্পূর্ণ পাতাশূণ্য হয়ে পড়ে। এ পোকার দেহ হতে এক ধরণের মিষ্টি রস বের হয়, যার ফলে গাছের পাতা ও কচি ডালে কালো দাগ পড়ে। এতে গাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

ব্যবস্থাপনা

- নার্সারি সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- নার্সারি নিয়মিত পরিদর্শন করে পোকার আক্রমণ দেখামাত্র আক্রান্ত ডগা ও শাখা-প্রশাখা কেটে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সাইলিড ভক্ষণকারী বন্ধু পোকা যেমন লেডি বার্ড বিটল ও মাকড়শাকে নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিকভাবে সাইলিড পোকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- সাইলিডের আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম জাত নির্বাচন বা আমদানি করে তার চাষ করতে হবে।
- পোকার আক্রমণ বেশি হলে যে কোন স্পর্শ বা পাকস্থলী বিষ যেমন ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ই প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে চারায় প্রয়োগ করে পাতা ও শাখা-প্রশাখা ভিজিয়ে দিতে হবে ।

উঁড়চুঙ্গা ও তার প্রতিকার

Brachytrypes portentosus Lichtenstein (Gryllidae: Orth.)

পোকার পরিচিতি

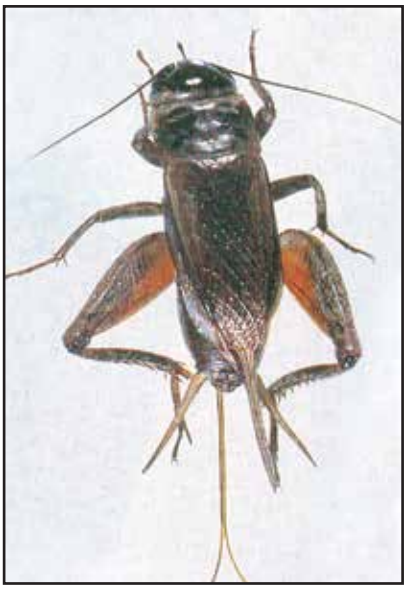

উঁড়চুঙ্গার বৈজ্ঞানিক নাম *Brachytrypes portentosus*। এটি প্রাণিজগতের Arthropoda পর্বের Orthoptera বর্গের Gryllidae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত এক ধরণের পতঙ্গ যা দেখতে কালচে বাদামী বর্ণের। এ পোকা রাতের বেলায় নার্সারিতে চারার গোড়া কেটে দেয়। দেহ বেশ বড়, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ সে.মি.। এরা কালচে বাদামী বর্ণের। সামনের পাখা মোটা ও অপেক্ষাকৃত শক্ত। পিছনের পাখা পাতলা কাগজের মত। তিন জোড়া পায়ের মধ্যে পিছনের পা বেশ মোটা ও শক্তিশালী। বাচ্চা বা নিম্ফগুলো ছোট আকৃতির, দেখতে প্রায় একই রকম, কিন্তু তাদের পাখা নেই। পূর্ণাঙ্গ পোকা মাটিতে গভীর গর্ত করে বাস করে এবং গর্তের তলদেশে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে সদ্য বের হওয়া নিম্ফগুলো কিছু দিন মাতৃবাসায় অবস্থানের পর ছড়িয়ে পড়ে। মে-জুন মাসে এরা পূর্ণাঙ্গ পোকায় রূপান্তরিত হয়। মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

ক্ষতির প্রকৃতি

এরা নার্সারির মাটিতে গর্ত করে গর্তের মুখের চারপাশে মাটি জমা করে। এরা রাতের বেলা চারার গোড়া কেটে গর্তে নিয়ে যায়। সেগুন, শিশু. ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, রাবার প্রভৃতি গাছের চারা এরা আক্রমণ করে।

ব্যবস্থাপনা

- নার্সারি নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।
- নার্সারি আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- পোকার গর্ত খনন করে বা গর্তে পানি ঢেলে পোকা বেরিয়ে এলে ধরে মেরে ফেলতে হবে।
- বিষ টোপ ব্যবহার করে উঁড়চুঙ্গা মারা যেতে পারে।
- উল্লেখিত ব্যবস্থায় পোকা দমন না হলে যে কোন স্পর্শ বা পাকস্থলী জাতীয় বিষ যেমন ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি বা ডার্সবান ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. মিশিয়ে পোকার গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

আকাশমণির ক্ষুদে মাকড় ও তার নিয়ন্ত্রণ
Unidentified mite (Tetranychidae: Trombidiformes)

পোকার পরিচিতি

এটি আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের ট্রমবিডিফরমিস (Trombidiformes) শ্রেণীর এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতির মাকড়শা। এরা এত ছোট যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। পূর্ণাঙ্গ মাকড়ের চার জোড়া বা আটটি পা থাকে এবং দেহ দু'টি খন্ডে বিভক্ত। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কের ৬টি পা থাকে। পূর্ণবয়স্ক মাকড়ের দেহ সাধারণত ১ মি.লি. এর নিচে থাকে। এরা সাধারণত লালচে রঙের হয়। বেশি গরম ও কম আর্দ্রতায় এদের আক্রমণ বেশি হয়। আবার বেশি আর্দ্রতায় ও বৃষ্টিপাতে সংখ্যা কমে যায়। শীতকালে এরা শুকনো লতা-পাতায় ও মাটিতে শীতনিদ্রা যায়। ছায়াযুক্ত স্থানে আক্রমণ কম হয়। বাতাস এদের বিস্তারলাভে সহায়তা করে। অনেক আগাছায় এরা বংশ বিস্তার করে।

ক্ষতির প্রকৃতি

ক্ষুদে মাকড় চারার পাতা হতে রস চুষে নেয়। এর ফলে পাতা বিবর্ণ হয়ে প্রথমে হলুদ হয়ে যায় এবং পরে শুকিয়ে মরে যায়। অনেক সময় পাতা কুঁকড়ে অথবা মরে যায়। অধিক আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ চারা মরে যেতে পারে। আকাশমনি ছাড়াও কড়ই, নারিকেল, ইউক্যালিপ্টাস, বাবলা, খয়ের, ম্যানজিয়াম, বরই, আম, জাম ইত্যাদির চারায় মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়।

ব্যবস্থাপনা

- নার্সারি সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- নিয়মিত নার্সারি পরিদর্শন করতে হবে যাতে মাকড় আক্রমণ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছিড়ে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলা যায়।
- আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে সাবান মিশ্রিত পানি গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।
- আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে পাতায় প্রয়োগ করলে মাকড় দমন হয়।
- উল্লেখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে মাকড় দমন না হলে যে কোন মাকড়নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি অথবা টলষ্টার ২.৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মি.লি. মিশিয়ে চারায় এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ চারা ভিজে যায়।
- নার্সারিতে ছায়া প্রদান করলে আক্রমণ কম হয়।

সজিনার কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ

Batocera rufomaculata (Cerambycidae: Col.)

সজিনা গাছ বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের আশে পাশে প্রায়ই চোখে পড়ে। এটি একটি নরম কাষ্ঠল মাঝারি আকৃতির গাছ। সজিনার পাতা ও ফল ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি জনপ্রিয় সবজি। সম্প্রতি দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে সজিনার গাছের কান্ড ছিদ্রকারী এক প্রকার পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা যায়।

পোকার পরিচিতি

সজিনার কান্ড ছিদ্রকারী পোকা সাধারণত লং হর্ণ বিটল বা লম্বা শুংযুক্ত বিটল জাতীয় পোকা নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পোকার শুং এত লম্বা যে তা দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি। এ পোকা ধূসর বা ছাই রঙের এবং দেহ লম্বায় প্রায় ৪.৫-৬.০ সে.মি.। পিঠের সামনে অর্ধ চন্দ্রকৃতির দুটি লালচে দাগ আছে। সামনের পাখনা দুটি শক্ত যা দেহের উপরে অংশকে ঢেকে রাখে। এ পাখনার উপর বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো হলুদ দাগ আছে। শুককীট হলুদাভ সাদা, ৬.০-৯.০ সে.মি. লম্বা ও বেশ মোটা-তাজা। শুককীট ও মূককীট দশা গাছের অভ্যন্তরে কাটায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে এবং সাধারণত মে-জুন মাসে তাদের বেশি দেখা যায়।

সজিনা ছাড়াও যে সমস্ত গাছ আক্রান্ত হয়

এ পোকা বহুভোজী বলে অনেক ধরনের গাছ আক্রমণ করে। সজিনা ছাড়াও আম, কাঠাল, জাম, কাল কড়ই, বাবলা, খয়ের, রাবার, শিমুল. শিশু. নারিকেল, জগ ডুমুর, বচ, অশ্বত্থ, পাঁকুড়, জিওল ভাদি (জিগা), শীল ভাদি, মাদার, হিঁজল, আমড়া, হলদু, উদাল, শাল, তুঁতসহ আরও অনেক গাছে আক্রমণ করে।

ক্ষতির ধরণ

প্রাপ্ত বয়স্ক পোকা নিশাচর হলেও গোধূলী বা সন্ধ্যার সময় বেশি সক্রিয় থাকে। এরা শাখা-প্রশাখার বাকল ও ডগার বর্ধিষ্ণু শীর্ষ খায়। স্ত্রীপোকা জীবন্ত দুর্বল বা সদ্য কাটা গাছের কান্ডে বাকলে ডিম পাড়ে। স্ত্রী পোকা গড়ে প্রায় ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে গাছের কান্ডের বাকল ছিদ্র করে বাকল ও কাঠের মাঝখানে এবং অনেক সময় কাঠের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং আঁকা-বাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে। সুড়ঙ্গপথ কাঠের চিবানো মোটা আঁশ ও পোকার বিষ্ঠ দ্বারা ভর্তি থাকে। বাকল ও কাঠ চিবয়ে খাওয়ার ফলে গাছে খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। ক্ষতস্থান দিয়ে পরে বৃষ্টির পানি ও ছত্রাক ঢুকে গাছে পচন ধরায়। ফলে কান্ড বা ডাল-পালা ভেঙ্গে গিয়ে গাছ সর্ম্পূন্ন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(ক) প্রতিরোধমূলক

- মৃত ও মৃতপ্রায় গাছ কেটে দ্রুত ফাড়াই/ছিড়াই করে শুকিয়ে কাঠ হিসেবে ব্যবহার অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে ভিতরে অবস্থিত পোকা মারা যায়।
- আস্ত কাঠ মজুতের প্রয়োজন হলে গাছ কাটার পরপরই বাকল তুলে ফেলতে হবে যাতে সেটি পোকার ডিম পাড়ার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে।
- সজিনা ও আশে-পাশের অন্যান্য পোষক গাছ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে প্রাথমিক অবস্থায় পোকা মেরে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- গাছের কান্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) প্রতিকারমূলক

- গাছে আক্রমণ দেখামাত্র কাণ্ডের আক্রান্ত অংশের বাকল ও সুড়ঙ্গপথ ছুরি বা চাকু দিয়ে পরিষ্কার করে ভিতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- পোকা কাঠের ভিতরে প্রবেশ করে থাকলে গর্তে বা সুড়ঙ্গপথে লোহার শিক অথবা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- হাত দিয়ে পোকা মারা সম্ভব না হলে পোকার সুড়ঙ্গপথ যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তাতে যে কোন ধুমায়িত কীটনাশক (যেমন ফসটক্সিন গর্তপ্রতি একটি হারে) প্রয়োগ করে গর্তের মূখ ভালোভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকা মারার পর ক্ষতস্থানে আলকাতরার প্রলেপ লাগাতে হবে যাতে সে স্থান দিয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টির পানি ঢুকে গাছে পচন সৃষ্টি করতে না পারে।
- গাছের কাণ্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতাঃ
কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

সেগুনের পাতাভোজী পোকা ও তার প্রতিকার

Hyblaea puera Cramer (Hyblaeidae : Lep.)

সেগুন বাংলাদেশে অতি মূল্যবান একটি গাছ। আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে এর কাঠ খুবই সমাদৃত। আমাদের সমাজে সেগুন কাঠের ব্যবহার আভিজাত্য ও বিলাসিতার প্রতীক। ১৮৭৩ সনে চট্টগ্রামের সীতা পাহাড় হতে এ দেশে সেগুন বাগান সৃজন কার্যক্রম হয়েছে এবং অদ্যবধি পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ গাছই হচ্ছে সেগুন। নানা প্রকার পোকা-মাকড়ের আক্রমণে সেগুন বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে পাতাভোজী অন্যতম একটি ক্ষতিকর পোকা, যা নার্সারি ও রোপিত গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম : সেগুনের পাতাভোজী পোকা
ইংরেজী নাম : Teak defoliator
বৈজ্ঞানিক নাম : *Hyblaea puera* Cramer

সেগুনের পাতাভোজী পোকা এক ধরণের গাঢ় রঙের মথ। মাথা ও দেহ ধূসর রঙের, উদর গাঢ় বাদামী। সামনের পাখা ধূসর রঙের এবং গাঢ় দাগযুক্ত, পিছনের পাখা গাঢ় বাদামী রঙের, যাতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কমলা রঙের দাগ থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা দিনে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী পোকা কচি পাতায় ৩০০-৮০০টি ডিম পাড়ে। ২-৪ দিনে ডিম ফুটে কীড়া বের হয়, যাকে শুককীট বলে। শুককীটগুলো বড় হয়ে মুককীটে পরিণত হয় এবং মুককীট হতে পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়ে আসে।

ক্ষতির ধরণ

গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরুতে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে সেগুনের কচি পাতায় পাতাভোজী পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগস্ট) মাস পর্যন্ত আক্রমণ চলতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় শুককীট পাতার প্রধান প্রধান শিরা-উপশিরা বাদে সম্পূর্ণ পত্র ফলক খেয়ে ফেলে। তৃতীয় ও চতুর্থ দশার শুককীট পাতার কিনারা মুড়িয়ে তার ভিতরে খেতে শুরু করে। মহামারী আকারে পোকার আক্রমণ হলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান পাতাশূণ্য হয়ে পড়ে। ঝরা পাতাগুলো বাগানে স্তূপ আকারে পড়ে থাকে। পাতা ঝরার ফলে যদিও গাছ মরে না, কিন্তু গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। চারা গাছ ও নার্সারিতে ব্যাপক পোকার আক্রমণ হলে ডগা শুকিয়ে মরে যায়। এমনকি অনেক সময় নার্সারি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সেগুন ছাড়াও পোকার বিকল্প পোষক গাছ যেমন বড় মালা, নিশিন্দা, বাইন ইত্যাদি এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পোকার নিয়ন্ত্রণ

(ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- নার্সারি ও বাগান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- একক প্রজাতির সেগুন বাগান না করে মিশ্র প্রজাতির বাগান করলে পোকা আক্রমণ কম হবে।
- সেগুনের পাতা ঝরা কালিন সময়ে পোকা বিকল্প পোষক গাছ বাগান হতে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পোকা আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম জাতের সেগুন চারা দিয়ে বাগান করতে হবে।

(খ) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

- নার্সারি বা নুতন বাগানে পোকার আক্রমণ হলে পোকার ডিম ও শুককীট হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।
- পোকা আক্রমণের শুরুতে নিম বিষ যেমন- নিমবিসিডিন নামক জৈব কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০ মি.লি (বোতলের ১ মুখ ৫ মি.লি. ঔষধ ধরে) ঔষধ মিশিয়ে গাছের পাতা, ডাল-পালা ও কান্ড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- আক্রমণ ব্যাপক হলে যে কোন স্পর্শক কীটনাশক যেমন- ম্যালাথিয়ন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০-২৫ মি.লি পরিমাণ মিশিয়ে গাছে ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- গাছের কাণ্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

সব ধরনের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী

ঘুণ পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকার

Dinoderus spp. (Bostrychidae : Col.)

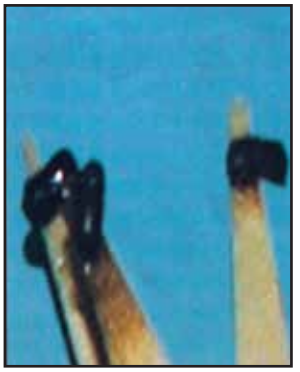

বাঁশ ও কাঠের ঘুণ পোকার আক্রমণের কথা কম-বেশি আমরা সবাই জানি। খাট, পালংক, কাঠের আলমারীসহ কাঠ, বেত ও বাঁশ জাত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও দ্রব্য সামগ্রীতে এদের আক্রমণ ঘটে এবং প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ ঘুণ পোকা আকারে খুবই ছোট এবং গাঢ় বাদামী রঙের হয়। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মি.মি.। শুককীট অবস্থায় দেহ মাখনের মতো সাদা ও মাথা বাদামী রঙের এবং আকৃতি ইংরেজি সি (C) বর্ণের ন্যায়। ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ পোকা হতে প্রায় ৩-৪ মাস সময় নেয়। বছরে ৩-৪টি প্রজন্ম দেখা যায়। ফলে প্রায় সারা বছরই এ পোকার দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

আক্রান্ত কাঠ, বেত ও বাঁশ

কড়ই, শিমুল, শাল, সেগুন, আম, জাম, কাঠাল, পাইন, মাদার, নিম, শিশু, তুন, গর্জন, গামার, বট, অর্জুন, তেঁতুল, ইত্যাদি কাঠ ও বাঁশ-বেতে ঘুণ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র, নির্মাণ সামগ্রী, খেলনা, দরজা-কপাটসহ বিভিন্ন ধরনের তৈরি সামগ্রীতে ঘুণ পোকার আক্রমণ হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি বা ধরণ

- বাঁশ, বেত বা কাঠের ক্ষতিগ্রস্ত বা কাটা স্থান দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ঘুণ পোকা ভিতরে প্রবেশ করে।
- বাঁশ ও বেতের ভিতর অংশ এবং কাঠের বাইরের অসার অংশে ঘুণ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।
- ঘুণ পোকা শুষ্ক বাঁশ, বেত বা কাঠের ভিতরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস করে।
- সুড়ঙ্গপথে বাঁশ, বেত বা কাঠ গুড়া করে তা ভক্ষণ করে এবং খাদ্য হিসেবে শুধু শর্করা অংশ গ্রহণ করে সাদা অবশিষ্ট অংশ বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে বের করে দেয়।
- আক্রান্ত কাঠ, বাঁশ বা বেতের আসবাবপত্র ও দ্রবাদির উপরে কিংবা নিচে স্তূপাকারে গুড়া পড়ে থাকতে দেখা যায়।

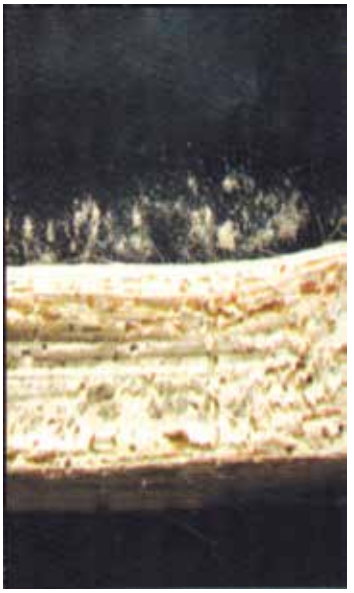

ঘুণ পোকার নিয়ন্ত্রণ

(ক) প্রতিরোধমূলক

- বাঁশ, বেত ও গাছ পূর্ণ বয়স্ক হলে কাটতে হবে।
- কাটার পর বাঁশ বা কাঠ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে যাতে এর শর্করা জাতীয় দ্রব্য পানিতে দ্রবীভূত হয়। এতে ঘুণের আক্রমণ কম হয়।
- কাঠের অসার অংশে শর্করা থাকে বিধায় তা সরাসরি ব্যবাহার না করা উচিত। অসার কাঠ ব্যবহার করতে হলে তা অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে সংরক্ষণ করে নিতে হবে।
- সার কাঠ এবং পোকা নিরোধী জাতের কাঠ ব্যবহার করা উত্তম।
- বাঁশ, বেত বা কাঠ রঙ, বার্নিশ বা মোম দিয়ে পালিশ করে অথবা আলকাতরা, গোবর বা খৈল দিয়ে ক্ষতস্থান বা কাটা অংশ ঢেকে দিলে পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।
- বাঁশ, বেত ও কাঠ গুদামজাত করার সময় অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর যে কোন স্পর্শ কীটনাশক (যেমন-ক্লোপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে) প্রয়োগ করলে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। (সাধারণত কীটনাশক বোতলের এক মুখে ৫ মি.লি. কীটনাশক ধরে)।
- গাছের কাণ্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) প্রতিকারমূলক

- আক্রান্ত বাঁশ, বেত ও কাঠের আসবাবপত্র ও দ্রবাদিতে ধুমায়িত বিষ (যেমন- ফসটক্সিন) প্রয়োগ করে ভেতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলা যায়।
- বাঁশ, বেত ও কাঠের ছোট সামগ্রী যেমন- ফুলদানী, ছাইদানী, খেলনা ইত্যাদি ফ্রিজের মধ্যে কয়েক দিন রাখলে পোকা মারা যাবে।
- পোকাক্রান্ত বাঁশ, বেত ও কাঠের অংশ আড়ত থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- গরম চুল্লিতে (৬০ সে. তাপমাত্রা ও ৮০-১০০% আদ্রতায়) আক্রান্ত কাঠ, বাঁশ বা বেত সামগ্রী ৩-৭ ঘন্টা রাখলে পোকা মরে যায়।
- আক্রান্ত বাঁশ, বেত ও কাঠে স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক (যেমন-ক্লোপাইরিফস) প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে প্রয়োগ করলে আক্রমণ কমে যাবে।
- গাছের কান্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতাঃ
কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

উঁই পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

Odontotermes sp., *Microtermes* sp., *Microcerotermes* sp. (Termitidae: Isoptera.)

নার্সারিতে অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা উঁই। উঁইপোকা সমাজ বদ্ধভাবে বসবাসকারী এক প্রকার পতঙ্গ। বাংলাদেশে *Odontotermes* sp., *Microtermes* sp., *Microcerotermes* sp. এ তিন গণের উঁইপোকা বেশি দেখা যায়। এরা সবাই Arthropoda পর্বের Isoptera বর্গের Termitidae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। এ পোকা নার্সারিতে বপনকৃত বীজ, চারা গাছের বাকল ও শিকড় খেয়ে ফেলে। এ পোকার আক্রমণে প্রতি বছর হাজার হাজার চারা বিনষ্ট হয়। উঁই পোকা সামাজিক জীব। এরা সমাজবদ্ধ ভাবে মাটির নিচে বাসা তৈরি করে অথবা মাটির উপরে ঢিবি গড়ে অথবা গাছের ভিতর সুড়ঙ্গ বানিয়ে বাস করে। মাটিতে বসবাসকরী উঁই পোকা মাটির অনেক গভীরে বাস করে এবং এরা মাটির উপরিস্তরে (সচরাচর ২ সে.মি. গভীরতার মধ্যে) বীজ ও চারা গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। অনেক সময় চারা গাছের কান্ডে বা বাকলের গায়ে উঁই পোকা নিজ মুখ নিঃসৃত লালা ও মাটি দিয়ে চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে।

ক্ষতির প্রকৃতি বা ধরণ

- উঁই পোকা চারা গাছের শিকড় ও বাকল খেয়ে ফেলে।
- অনেক সময় চারা গাছের মূল শিকড়ের বাকল গোলকার (রিং আকারে) করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে পানি বা খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হয়ে চারা শুকিয়ে মরে যায়।
- কম বয়সী চারা (১-২ বছর) গাছ বেশি আক্রান্ত হয়। চারা উঠানো ও রোপণের সময় শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- অনেক সময় উঁই পোকা গাছের ক্ষতিগ্রস্ত শিকড়ের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ করে কান্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের কাষ্ঠল অংশ খেয়ে ফেলে।
- শুষ্কতার হাত হতে বাঁচার জন্য এরা নিজ মুখ নিঃসৃত লালা ও মাটি দিয়ে গাছের কান্ড বা বাকলের উপর চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে এবং বাকল চিবিয়ে খায়।
- চারা গাছের শিকড় ও বাকল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে চারা শুকিয়ে যায়।

সাধারণত গাছের মৃত অংশই উঁই পোকার প্রধান খাবার। উঁই পোকা কাঠ ও কাঠ জাতীয় বস্তুও খেয়ে থাকে।

আক্রান্ত গাছ-গাছড়া

ইউক্যালিপটাস, কাঠাল, ঝাউ, তুন, পাইন, শাল, সেগুন, শিশু, আমড়া, মেহগনি, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি গাছ ছাড়াও মাটিতে বপনকৃত বিভিন্ন বীজ ও চারা গাছ উঁই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

খাদ্য গ্রহণ ও বাসস্থানের ভিত্তিতে উঁই পোকার প্রকারভেদ

খাদ্য গ্রহণ ও বাসস্থানের ভিত্তিতে উঁই পোকা তিন প্রকার হয়ে থাকেঃ

(ক) ভিজা কাঠভোজী উঁই পোকাঃ এরা সাধারণত মাটিতে অবস্থিত ভিজা কাঠ খেয়ে থাকে।

(খ) শুষ্ক কাঠভোজী উঁই পোকাঃ এরা প্রধানত শুকনো কাঠ খেয়ে থাকে।

(গ) মাটির নিচে বসবাসকারী তৃণভোজী উঁই পোকাঃ এরা সাধারণত বীজ, চারা, শুকনো লতা-পাতা ইত্যাদী খেয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মাটির নিচে বসবাসকারী উঁই পোকাই চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে থাকে।

উঁই পোকার নিয়ন্ত্রণ

(ক) প্রতিরোধমূলক

- নার্সারি প্রস্তুতের সময় নার্সারির মাটিতে বিদ্যামান ঘাস, খড়, শুকনো লতা-পাতা, মরা ডাল-পালা, কাঠের টুকরো ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- বাগানের ভিতরে অথবা নিকটে উঁই পোকার বাসা বা ঢিবি থাকলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- মাটিতে বীজ বপনের আগে কীটনাশক যেমন- ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে তাতে বীজ ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে রোপণ করতে হবে (সাধারণত কীটনাশক বোতলের মুখে ৫ মি.লি. ঔষধ ধরে)।
- নার্সারিতে চারা রোপণ বা বীজ বপনের পূর্বে ক্লোরপাইরিফস নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করতে হবে।
- চারা গাছের কান্ডে উঁই পোকার তৈরিকৃত চলাচলের সুড়ঙ্গ পথ ভেঙ্গে দিতে হবে।
- চারা রোপনের সময় বা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় নষ্ট বা কেটে না যায়।
- গাছের কান্ডের বাকলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্পর্শ জাতীয় কীটনাশক যেমন ক্লোরপাইরিফস প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) প্রতিকারমূলক

- প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি আক্রমণ দেখা যায় তখন বীজতলায় ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এ কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মি.লি. পরিমাণ মিশিয়ে এমন ভাবে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে যেন কীটনাশক মিশ্রিত পানি গভীরে পৌছায়। ১০ দিন অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার এভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করলে উঁই পোকা দমন করা সম্ভব হবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতাঃ

কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

রোগ-বালাই

নার্সারিতে চারার ঢলে পড়া রোগ ও ব্যবস্থাপনা

ক্ষতির ধরণ

- এটি নার্সারির একটি প্রধান রোগ।
- চারা গজিয়ে মাটির উপরে আসার পূর্বে অথবা গজানোর কয়েক দিনের মধ্যেই চারাগুলো এ রোগে আক্রান্ত হয়।
- প্রবল বৃষ্টি এবং ভ্যাপসা গরমের সময় সাধারণত এ রোগ দেখা যায়।
- হঠাৎ এ রোগ দেখা যায় এবং অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

কেন এ রোগ হয় ?

- নার্সারিতে খুব ঘনভাবে চারা উত্তোলন করলে,
- নার্সারির বেডে পানি জমে থাকলে,
- মাটিতে কাদার পরিমাণ বেশি থাকলে,
- কতিপয় ছত্রাক যেমন- *Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia solani* এর আক্রমণে ঢলে-পড়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

কোন জাতের চারা আক্রান্ত হয় ?

- কাঁঠাল, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, কদম, গামার, গর্জন, মেহগনি, পেঁপে, টমেটো, কপি, বেগুন, মরিচ, অশ্বগন্ধ্যা ইত্যাদি।

লক্ষণ

ক) চারা গজানোর পূর্বে

- চারা গজিয়ে মাটির উপরে আসার পূর্বেই মারা যায়।
- রোগের লক্ষণ চোখে পড়ে না বলে চারা না গজানোর জন্য বীজের নিম্নমানকে দায়ী করা হয়।

খ) চারা গজানোর পরে

- কচি চারার কাণ্ডে এবং প্রধানত গোড়ায় পচনের দাগ দেখা যায়।
- পচনের দাগগুলো দ্রুত বড় হতে থাকে।
- চারাগুলো গোড়ায় পচে এক পাশে ঢলে পড়ে।

প্রতিকার

- নার্সারি বেডের মাটি কুপিয়ে নিচের মাটি উপরে এনে কয়েক দিন ধরে রোদে শুকিয়ে নিন।
- ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করে নিন।
- ফরমালিন (বাণিজ্যিক) ও পানি ১:১০ অনুপাতে মিশিয়ে এমন ভাবে মাটি ভিজাতে হবে যাতে তা মাটির ১০-১৫ সেন্টিমিটার গভীরে প্রবেশ করে।
- সাদা পলিথিন শীট দিয়ে বেডের মাটি ৩ দিন ঢেকে রাখুন।
- নার্সারি বেডের পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেনের ব্যবস্থা রাখুন।
- বেডে সুষম সার ব্যবহার করুন।

- বপনের পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নিন (১ কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম ব্যাভিস্টিন অথবা প্রয়োজন মতো বোঁর্দো মিশ্রণ ব্যবহার করুন)।
- অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য চারার উপরে পলিথিন শীটের ঢাকনা বা চালা করে দিন।
- রোগ দেখা মাত্র প্রতি ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ ছত্রাকনাশক ভালভাবে মিশিয়ে বা বোঁর্দো মিশ্রণ তৈরি করে স্প্রে মেশিন দ্বারা আক্রান্ত চারার উপর ছিটিয়ে দিন।
- ছোট বীজের চারা উত্তোলনের জন্য প্লাস্টিক বা মাটির ছিদ্রযুক্ত ট্রে বা পাত্র ব্যবহার করুন।

ছত্রাকনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ
ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক

চারার শিকড় পঁচন রোগ ও ব্যবস্থাপনা

রোগের কারণ

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সেচ প্রদান, চারার ঘনত্ব খুব বেশি এবং কাদা-মাটির নার্সারি বেড যেখান থেকে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় না এমন নার্সারিতে এ রোগের প্রার্দুভাব ঘটে। তাছাড়া নার্সারি বেড কিংবা পলিব্যাগে অতিরিক্ত গোবর সার প্রয়োগ এবং জলাবদ্ধতার জন্য চারার শিকড়গুলো দ্রুত পচে যায়। অনুকূল পরিবেশে মাটিতে বিদ্যমান জীবাণুসমূহ বিভিন্ন পোষক চারাগাছের শিকড় আক্রমণ করে এবং সেগুলো পঁচে যায়। শিকড় পচন রোগ দ্রুত সুস্থ চারাগাছে ছড়ায় বলে নার্সারিতে ব্যাপক চারা কম সময়ে আক্রান্ত হয়ে মরে যায়। প্রজাতিভেদে রোগাক্রান্ত চারার শিকড় থেকে যেসব ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক্র.ন.	প্রজাতির নাম	ছত্রাকের/ব্যাকটেরিয়ার নাম
১	ইপিল-ইপিল	*Fusarium solani*
২	মেহগনি	*Fusarium solani, Rhizoctonia solani*
৩	বাবলা	*Fusarium oxysporum*
৪	আম	*Fusarium solani*
৫	ইউক্যালিপ্টাস	*Fusarium oxysporum*
৬	কাঁঠাল	*Fusarium solani*
৭	কদম	*Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Pythium* spp, *Phytophthora* spp

ক্র.ন.	প্রজাতির নাম	ছত্রাকের/ব্যাকটেরিয়ার নাম
৮	বকুল	*Fusarium oxysporum, Pythium* spp.
৯	আগর	*Fusarium solani*
১০	কামরাঙ্গা	*Fusarium oxysporum*
১১	নাগেশ্বর	*Fusarium solani*
১২	গামার	*Fusarium solani*
১৩	সেগুন	*Pseudomonas solanacearum*
১৪	রাবার	*Fusarium* sp.
১৫	অশ্বগন্ধা	*Fusarium solani*

লক্ষণ

কয়েকদিন থেকে এক বছর বয়স্ক চারা এ রোগে আক্রান্ত হয়। চারার শিকড়ে বাদামী থেকে কাল রঙের পঁচা দাগ দেখা যায়। চারার অধিকাংশ কচি শিকড় পঁচে যায় এবং গোড়া পর্যন্ত পঁচনের চিহ্ন দেখা দেয়। পাতার সবুজ রং হালকা হয়ে যায়, শীর্ষমুকুল মরে যায় এবং বয়স্ক পাতা ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই চারাগুলো মরে যায়।

ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত, সুস্থ, সবল ও উচ্চ মাত্রার অংকুরোদগম ক্ষমতার অধিকারী বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- বীজ বপনের পূর্বে নার্সারির মাটি ইতিপূর্বে বর্ণিত উপায়ে বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।
- নার্সারি অবশ্যই জলাবদ্ধতামুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- চারার ঘনত্ব যাতে খুব বেশি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- জৈব সার খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।
- নিয়মিত এবং পরিমিত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ দেখামাত্র কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা সানভিট ৫০ ডব্লিউপি ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে নার্সারিতে এমনভাবে ছিটাতে হবে যাতে ঔষধমিশ্রিত পানিতে মাটি ভিজে যায়।

হাইব্রিড একাশিয়া চারার পাউডারি মিলডিউ ও তার প্রতিকার

রোগের কারণ

দেশের বিভিন্ন নার্সারিতে বর্তমানে হাইব্রিড একাশিয়ার চারা উত্তোলন করা হচ্ছে। শীতকালে এসব চারার পাতায় *Oidium* sp. নামক এক প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। পাতায় ছত্রাকের উপস্থিতি সাদা পাউডারের ন্যায় দেখা যায় বলে এ রোগের নাম পাউডারী মিলডিউ। শীতকালে বিশেষত কুঁয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে এ ছত্রাকের দ্রুত বিস্তার ঘটে। রাবার গাছের চারাও এ রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

পাঁচ/ছয় মাস থেকে এক বছর বয়স্ক হাইব্রিড একাশিয়া চারার সবুজ পাতায় সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায়। পাতার নিচের চেয়ে উপরের অংশে ছত্রাকের উপস্থিতি বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এতে পাতার সবুজ রঙ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। এ ছত্রাকের আক্রমণে পত্রফলক কুঁচকে ও কাল হয়ে শুকিয়ে যায়। শীর্ষমুকুল ও ডাল-পালাও এ ছত্রাকের আবরণে ঢাকা পড়ে। ফলে চারার উপরের দিকের ডাল-পালা শুকিয়ে মরে যায়।

ব্যবস্থাপনা

- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ছিড়ে মাটিতে পুঁতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে নিউবেন ৭২ ডব্লিউপি নামক ছত্রাকনাশকের ২ গ্রাম পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে চারার উপর এমনভাবে ছিটাতে হবে যাতে চারা সম্পূর্ণ ভিজে যায়।

ইউক্যিালিপটাস চারার আগা মরা রোগ ও তার প্রতিকার

রোগের কারণ

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর বিভিন্ন গ্রামীণ নার্সারিতে প্রচুর ইউক্যালিপ্টাস চারা উত্তোলন করা হয়। সাধারণত উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সৃষ্ট দুর্বল চারায় এ রোগ দেখা দেয়। *Schizophyllum commune* নামক সুযোগসন্ধানী ছত্রাকের আক্রমণে ইউক্যালিপ্টাস চারার আগামরা রোগ হয়।

লক্ষণ

ছয় মাস থেকে এক বছর বয়স্ক ইউক্যালিপ্টাস চারায় এ রোগ দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত চারার শীর্ষমুকুল মরে যায় এবং পাতাগুলো কাল হয়ে যায়। কচি কান্ডে কাল দাগসহ ক্যাঙ্কার সৃষ্টি হয়। উপর থেকে চারাগুলো শুকিয়ে নিচের দিকে মরে যেতে থাকে। অনেক সময় উপরের দিকের মৃত কাল কান্ডে ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত ও পুষ্ট বীজ থেকে চারা উত্তোলন করতে হবে।
- চারা স্থানান্তরের সময় ও বেড থেকে পলিব্যাগে স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চারার ক্ষতি না হয়।
- দীর্ঘদিন নার্সারিতে চারা ফেলে রাখা পরিহার করতে হবে।
- নার্সারিতে ঠিকমত পানি ও পুষ্টির যোগান দিতে হবে।
- রোগ দেখামাত্র ব্যাভিস্টিন ডিএফ অথবা এমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি ছত্রাকনাশকের ২ গ্রাম পাউডার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে চারার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

বেতের পাতায় দাগপড়া রোগ ও তার প্রতিকার

রোগের কারণ

সচরাচর পানি ও পুষ্টিহীনতার জন্য পাতায় দাগপড়া রোগ দেখা দেয়। *Guignardia calami* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। শুস্ক মৌসুমে এ রোগের বিস্তার ঘটে বেশি। প্রায় সকল প্রজাতির বেতের চারা এ রোগে কমবেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে জালি বেতের (*Calamus tenuis*) চারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

আক্রান্ত চারার পাতার উপরের অংশে ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। প্রথমে দাগগুলো হালকা বাদামী থেকে খয়েরি রঙের হয় এবং পরে গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে। ছোট ছোট দাগগুলো বড় হতে থাকে এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেশ বড় আকারের দাগের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে দাগগুলোর মাঝখানের অংশ শুকিয়ে যায় এবং এক সময় ঝরে পড়ে। পাতার কিনারা এবং মাঝের অংশের বিভিন্ন জায়গা শুকিয়ে যায়। চারার নিচের দিকের পাতা বেশি আক্রান্ত হয়।

ব্যবস্থাপনা

- চারায় সঠিক পুষ্টির যোগান দিতে হবে।
- নার্সারিতে সময়মত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আক্রমণ দেখামাত্র ডায়াথেন এম-৪৫ ছত্রাকনাশকের ২ গ্রাম পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে চারার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

নিমের পাতায় দাগপড়া রোগ ও তার প্রতিকার

রোগের কারণ

শুষ্ক মৌসুমে নিমের চারার পাতায় দাগপড়া রোগ পরিলক্ষিত হয়। এটি এক প্রকার ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটি *Cercospora subsessilis* নামে পরিচিত।

লক্ষণ

নিমের পাতার উপরে প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট দাগ দেখা যায়, যেগুলোর কেন্দ্র ঘন বাদামী রঙের এবং বাইরের অংশ ফ্যাকাসে সাদা। পরে দাগগুলো আকারে বড় হতে থাকে। ছোট ছোট দাগগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং প্রায় সম্পূর্ণ পাতা ছেয়ে যায়। চারার শীর্ষমুকুল এক সময় শুকিয়ে যায় এবং পাতা অকালে ঝরে যায়।

ব্যবস্থাপনা

- নার্সারিতে খুব ঘন করে চারা উত্তোলন করা পরিহার করতে হবে।
- নিয়মিত সেচ প্রদান এবং চারার পুষ্টির প্রতি নজর দিতে হবে।
- নার্সারিতে আংশিক ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অধিক বয়স্ক চারা নার্সারিতে রাখা পরিহার করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে ডায়াথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশকের ২ গ্রাম পাউডার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে রোগাক্রান্ত চারার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে।

বাঁশের মড়ক দমন ব্যবস্থা

আপনার বাঁশের ঝাড়ে কি বাঁশের আগা মরে যাচ্ছে ?

এ রোগের জন্য দায়ী এক ধরনের ছত্রাক যা মাটিতে বাস করে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Sarocladium oryzae*। সাধারণত বরাক বা বড় বাঁশ, মাকলা বাঁশ, তল্লা বাঁশ এবং বাইজ্যা বাঁশ ঝাড়ে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা যায়।

এ রোগটি চিনবেন কিভাবে ?

প্রাথমিক অবস্থায় নতুন কোঁড়ল আক্রান্ত হলে

- কোঁড়লের আগা বাদামি-ধূসর রঙের হয়ে সব খোলস ঝড়ে পড়ে
- এক সময় আগা পচে ধীরে ধীরে বাঁশটি শুকিয়ে যায়।

কম বয়সি বাড়ন্ত বাঁশ আক্রান্ত হলে

- এর মাথায় বাদামি-ধূসর রঙের দাগ দেখা যায় এবং আক্রান্ত বাঁশের সকল খোলসপত্র ঝড়ে পড়ে।
- এক সময় আগা পচে ভেঙ্গে পড়ে বা ঝুলে থাকে।
- আক্রান্ত অংশের নিচের গিট থেকে অসংখ্য কঞ্চি বের হয়।
- পরবর্তীতে রোগ নিচের দিকে আগাতে থাকে এবং এক সময় পুরো বাঁশটি নষ্ট হয়ে যায়।

বয়স্ক বাঁশে এ রোগ দেখা দিলে

- আগা পচে যায়, ফলে বাঁশের মাথা ভেঙ্গে পড়ে। দূর থেকে এ ধরনের ঝাড়কে মাথাশূণ্য ও আগুনে ঝলসানো বাঁশ ঝাড় বলে মনে হয়।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পুরো বাঁশ ঝাড়ই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এ রোগ ছড়ায় কিভাবে ?

- রোগাক্রান্ত মুথা বা রোগাক্রান্ত বাঁশের কঞ্চিকলমের চারা ব্যবহার করলে।
- আক্রান্ত বাঁশ ঝাড়ের মাটি ব্যবহার করলে।
- ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি না দিলে।
- গোড়ায় জমে থাকা পাতা ও আবর্জনা সরিয়ে না ফেললে।
- বাঁশ ঝাড়ে কীট-পতঙ্গ (বিশেষ করে পিঁপড়া) বেশি থাকলে।

প্রতিরোধ ও দমন করবেন কিভাবে ?

- সকল আক্রান্ত বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে পুড়িয়ে ফেলুন।
- বাঁশ গজানোর আগে গোড়ায় জমে থাকা কঞ্চি, আবর্জনা, শুকনো পাতা, আক্রান্ত বাঁশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন (আগুন দেওয়ার সময় সর্তক থাকতে হবে যাতে আশেপাশের বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়)।
- প্রতি বছর নতুন বাঁশ গজানোর পূর্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি দিন।
- পুরানো বাঁশ ঝাড়ের মাটি ব্যবহার না করে পুকুরের তলার মাটি অথবা দূরের পলিযুক্ত মাটি ব্যবহার করুন।

- ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ (ছত্রাকনাশক) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে ঝাড়ের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিন।
- নতুন কোঁড়ল ৩-৪ হাত লম্বা হওয়ার আগে একই ছত্রাকনাশক দিয়ে ভিজিয়ে দিন।

জেনে রাখা ভাল

- আক্রান্ত এলাকায় নতুন গজানো সকল বাঁশেই এ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
- কোঁড়ল গজানোর ৩ মাসের মধ্যেই বাঁশ সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে শুধুমাত্র পরিপক্ক হয়।
- যদি কোন বাঁশ তার বৃদ্ধির সময়ে পরিপূর্ণ সুস্থ থাকে, তবে পরবর্তীতে মড়ক আর ক্ষতি করতে পারে না।

কোন বালাইনাশক ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেখা পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে

শিশু গাছের মড়ক ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

শিশু গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Dalbergia sissoo*। এটি দ্রুত-বর্ধনশীল গাছ যা হিমালয়ের উঁচু পাহাড় থেকে শুরু করে নিম্ন সমতল ভূমিতে জন্মাতে পারে। শিশু গাছের কাঠ খুবই মূল্যবান। গৃহ সজ্জার নানাবিধ সামগ্রী, খুটি এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি, কৃষি এবং সামাজিক বনায়নে শিশু গাছের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বৃক্ষরোপণে শিশু গাছের ব্যবহার

শিশু গাছের বহুবিধ উপযোগিতা থাকায় এবং দ্রুত-বর্ধনশীল হওয়ায় এদেশে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়নে এর ব্যবহার রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরাংশের জেলাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে এর চাষ করা হয় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বন বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা এবং কৃষকগণের মাধ্যমে সড়ক, জনপথ ও রেল লাইনের দু'ধারে, বাধ, খাল ও পুকুরের পাড়, প্রান্তিক ও অব্যবহৃত স্থান, গোরস্থান, বসতবাড়ি আশপাশ এমনকি ফসলের ক্ষেত ও আইলে শিশু গাছের আবাদ করা হচ্ছে।

শিশু গাছ

মড়ক সমস্যার উদ্ভব

১৯৯১ সনে কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার গৌরীপুর-হোমনা সড়কের দু'পাশে রোপিত শিশুর চারা গাছের প্রথম মড়ক দেখা যায়। এরপর দেশের অনেক স্থানে মড়ক দেখা যায়। ১৯৯৬ সনের মধ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরাংশের জেলাগুলোতে মড়কের বিস্তার ঘটতে থাকে। উক্ত সমস্যাটির বিষয়ে দেশের বিভিন্ন গণ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ফলে বিভিন্ন সংস্থার বিশেষভাবে কৃষকগণ শিশু গাছের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন। এ সময়ে বাংলাদেশে ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারত, পাকিস্থান ও নেপালে মড়ক পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিশু গাছের মড়কের বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রয়াস

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগীতায় ২০০০ সনের ২৫-২৮ এপ্রিলে নেপালের কাঠমুন্ডুতে শিশু মড়ক বিষয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সার্ক অঞ্চলের উপদ্রুত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি যৌথ গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। যা হোক, বাংলাদেশে এ বিষয়ে নিজস্ব গবেষণা কার্মকান্ড পরিচালনা করে।

শিশু মড়কের লক্ষণ

বর্ষাকালে এ রোগের লক্ষণ ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় গাছের পাতা নিস্তেজ হয়ে হলুদ বর্ণ ধারন করে। প্রথমে গাছের নিচের দিকের ডালের পাতা এবং পরে উপরের দিকের ডালের পাতা ঢলে পড়ে। গাছের গোড়া থেকে কয়েক মিটার উঁচু পর্যন্ত স্থানে গাঢ় বাদামী রঙের রস নিঃসৃত হতে দেখা যায়। পরে নিঃসৃত রস জমাট বেধে কাল রঙ ধারণ করে। রোগাক্রমণের শেষ পর্যায়ে গাছ গুলো যখন দূর্বল হয়ে যায়

তখন গাছের কান্ডের বাকলে এক প্রকার বাকল-ছিদ্রকারী পোকার অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায়। এ সময় সম্পূর্ণ গাছটি মরে যায়। বিভিন্ন বয়সের শিশু গাছে মড়ক দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাশে গাছে দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটে।

মরা শিশু গাছ

আক্রান্ত অবস্থা

মড়কের সম্ভাব্য কারণ

আক্রান্ত শিশু গাছের শিকড়, বাকল ও ফল থেকে এক প্রকার ছত্রাক পৃথক করণ করা হয়েছে যা *Fusarium solani* হিসেবে পরিচিত। উক্ত ছত্রাক এদেশের মাটিতে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যামান। বিভিন্ন কারণে শিশু গাছ দূর্বল হয়ে গেলে এবং রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়লে ঐ ছত্রাক শিকড় দিয়ে গাছে প্রবেশ করে এবং এতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু মড়কের সাথে যে সব বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলো হলো বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা কিংবা খড়া, জলাবদ্ধতা, অতি ও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। অধিক কাদাযুক্ত এবং শক্ত বৃনটের জলাবদ্ধ মাটিতে অক্সিজেনের ঘাটতি থাকায় এবং শিকড় প্রবেশে বাধাগ্রস্থ হওয়ায় শিশু গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন অনুজীব সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ শিকড়ে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। দেখা গেছে যে, আলোচ্য ছত্রাক প্রথমে মৃত এবং ক্ষতিগ্রস্থ শিকড়ের মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করে এবং ক্রমান্বয়ে গাছে রোগ সৃষ্টি করে। রোগাক্রান্ত গাছের শিকড়ের সংস্পর্শে থাকলে পাশের সুস্থ গাছেও রোগের বিস্তার ঘটে। যে জায়গাতে জলাবদ্ধাতাজনিত সমস্যা নেই ও যে মাটিতে অল্প কাদা এবং অধিক বালুকণা বিদ্যামান সেসব জায়গাতে এ রোগ প্রায় নেই। তবে ঐসব জায়গাতে অক্সিজেনর ঘাটতি কিংবা জলাবদ্ধতা সমস্যা থাকলে রোগাক্রমণ হতে পারে। নার্সারি এবং ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এ ছত্রাকটি শিশু গাছের মড়ক ঘটাতে সক্ষম। বড় শিশু গাছে এ ধরনের পরীক্ষা কাজ চলছে এবং ছত্রাকটি দমনের উপর গবেষণা কাজ অব্যাহত রয়েছে।

শিশু মড়কের ব্যাপকতা

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিশু গাছের ক্ষতির বিষয়ে যে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে তাতে ছুয়াডাঙ্গা জেলাতে রোগাক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি (৬৪.০%) এবং ময়মনসিংহ জেলাতে সবচেয়ে কম (২১.৭%)। অন্যান্য যেসব জেলায় ৫০% এর বেশি মড়ক দেখা গিয়াছে সেগুলো হলো কুমিল্লা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এবং রংপুর তথ্য ছকে সন্নিবেশিত।

বিভিন্ন জেলায় শিশু গাছে রোগাক্রমণের অবস্থা

জেলা	স্বল্প আক্রান্ত	মধ্যম আক্রান্ত	মারাত্মক আক্রান্ত	মৃত	গড় রোগাক্রমণ
বগুড়া	৩.৬	৩.০	৩.৮	১৭.৮	**২৮.২**
দিনাজপুর	৫.৪	৩.১	৫.৭	১৬.৯	**৩১.১**
রাজশাহী	১.২	১.৬	৩.২	৪০.৮	**৪৬.৮**
যশোর	৩.৫	৫.০	৮.৬	৩১.২	**৪৮.৩**
নাটোর	২.৮	৪.২	৩.৬	৩০.১	**৪০.৭**
মেহেরপুর	১.৫	৪.৮	৯.২	৪২.৬	**৫৮.১**
ঝিনাইদহ	২.৫	৬.২	১২.৩	২৬.১	**৪৭.১**
চুয়াডাঙ্গা	০.০	৩.০	১৪.৯	৪৬.৪	**৬৪.৪**
কুষ্টিয়া	২.৩	২.৩	৫.২	৪৫.৪	**৫৫.২**
মাগুড়া	১.৮	১.৯	৪.১	১৪.৫	**২২.৩**
পাবনা	৪.১	২.৭	৫.৩	২৬.০	**৩৮.১**
রংপুর	২.১	১.৯	৩.৬	৪৫.৫	**৫৩.১**
ঢাকা	৩.১	৪.১	৫.৯	১৭.৭	**৩০.৮**
কুমিল্লা	১.৩	১.১	১৩.৩	৪৭.১	**৬২.৮**
ময়মনসিংহ	৬.৫	৪.৯	৩.৪	৬.৯	**২১.৭**
গড় রোগাক্রমণ	**২.৮**	**৩.৩**	**৬.৮**	**৩০.৩**	**৪৩.২**

মড়ক প্রতিরোধে কয়েকটি সুপারিশ

- শিশু একক নিবিড় চাষ না করে উপযুক্ত সহযোগী প্রজাতির নির্বাচন করে মিশ্র প্রজাতির বাগান করা দরকার।
- মৃত এবং মৃতপ্রায় গাছ সত্বর কেটে এহুলো ব্যবহার করা দরকার।
- বালিযুক্ত এবং পানি-নিষ্কাশনযোগ্য মাটিতে শিশুর চাষ করা দরকার।
- চারাগাছ এবং বড় গাছের শিকড় যাতে কোন ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।
- রোগমুক্ত এবং সবল গাছের বীজ থেকে চারা উত্তোলন করে শিশু গাছ রোপন করা উচিৎ।

অর্শ্বগন্ধার রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

অর্শ্বগন্ধা (*Withania somnifera* Dunal) সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারের একটি গুল্ম জাতীয় চির সবুজ উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের ফুল, পাতা, ফল ও বীজসহ সমস্ত অংশই ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। সাধারণত বার্ধক্যজনিত ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা রোগের চিকিৎসায় এ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহুবিধ ঔষধীয় গুণাবলীর জন্য বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নাটোর জেলাতে প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে এর চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত রিপোর্ট হতে অর্শ্বগন্ধার বিভিন্ন রোগ-বালাই এর সমস্যা বিজ্ঞানীদের গোচরীভূত হয়, যার মধ্যে শিকড় পঁচন ও পাতার ব্লাইট (ঝলসানো) নামক দুটি রোগ বেশি দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের রোগাক্রমণের ব্যাপকতার কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে চাষীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ক) শিকড় পঁচন রোগ (জড়ড়ঃ ৎড়ঃ)

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

চারার শিকড়ে ও গোড়ায় ছত্রাক সংক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়। আক্রান্ত শিকড়ে বাদামী থেকে কাল রঙের দাগ দেখা যায়। অধিকাংশ শিকড় পচে যায় এবং গোড়া পর্যন্ত পঁচনের চিহ্ন দেখা যায়। পাতার সবুজ রং হালকা হলুদাভ হয়। শীর্ষমুকুল মরে যায় এবং বয়স্ক পাতা ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই চারাগুলো মরে যায়। অনুকূল পরিবেশে মাটিতে বিদ্যমান জীবাণুসমূহ চারা গাছের শিকড়ে পঁচন দ্রুত সংক্রামিত করে। ক্রমান্বয়ে সুস্থ গাছেও রোগের বিস্তার ঘটে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ চারা মরে যায় এবং কোন কোন সময় শতভাগ চারাই মরে যেতে পারে।

রোগের কারণ

শিকড় পঁচন অর্শ্বগন্ধার অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগের আক্রমণের ফলে অনেক চারা মরে যায়। অর্শ্বগন্ধা চারা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই নীচু এবং জলাবদ্ধ জমিতে অর্শ্বগন্ধার চারাতে পঁচন রোগের আক্রমণ প্রায়ই দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ রোদ ও ভ্যাপসা গরমে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। ফিউজেরিয়াম সোলানী (*Fusarium solani*) নামক এক ধরনের ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ী।

নার্সারির বেডে অর্শ্বগন্ধার রোগাক্রান্ত চারা

অর্শ্বগন্ধার রোগাক্রান্ত শিকড়

ব্যবস্থাপনা

- উচু ও সু-নিষ্কাশিত জমি নির্বাচন করা প্রয়োজন।
- লাঙ্গল দিয়ে বা কোদাল দিয়ে মাটি কর্ষণ করে কয়েকদিন রৌদ্রে রাখলে মাটির অনেক জীবাণু নষ্ট হয়ে যাবে।
- জমি তৈরির সময় মাটিতে জৈব সারের সাথে নিম জৈব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- জমিতে সুষম মাত্রায় খাদ্যের যোগান দিতে হবে।
- বীজ বপনের পূর্বে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করে নিতে হবে (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি)।
- রোগমুক্ত, সুস্থ সবল মাতৃ গাছের বীজ ব্যবহার করা ভাল।
- বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ২-৪ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাক নাশক (ব্যাভিস্টিন, এমকোজিম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- বাগানে চারার ঘনত্ব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত থেকে চারা রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপরে চালা বা পলিথিনের সীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, ভ্যাপসা গরম ও ঘন কুয়াশা পড়লে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ২-৩ বার বোর্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করলে রোগ প্রতিরোধ হবে (১ লিটার পানিতে ৮ গ্রাম চুন ও ৮ গ্রাম তুঁতে)।
- উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি রোগ নিয়ন্ত্রণ না হয় তখন ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন ডায়থেন এম-৪৫ (Dithane M-৪৫) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করলে রোগ দমন হবে।

(খ) লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো রোগ (Leaf blight)

রোগের কারণ

সাধারণত শুষ্ক মওসুমে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এটি এক ধরনের ছত্রাক জনিত রোগ। অলটারনারিয়া সাইট্রি (*Alternaria citri*) নামক ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগের জন্য অশ্বগন্ধার উৎপাদন হ্রাস পায় এবং অনুকুল পরিবেশে শতকরা ৭০-৯০ ভাগ চারা মরে যায় এমনকি শতভাগ চারাও মরে যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

চারা এবং বয়স্ক উভয় প্রকার গাছেই এই রোগ দেখা যায়। অশ্বগন্ধা চারার বয়স ৩-৪ মাস হলে এই রোগ বেশি দেখা যায়। প্রথমে গাছের পাতার অগ্রভাগ ও কিনারায় হালকা হলুদ রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ধীরে ধীরে আকারে বড় হতে থাকে এবং কেন্দ্রের জায়গা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। কয়েক দিন পরে ঐ স্থানে ফাঁকা অংশের সৃষ্টি হয়। পাতার কিনারা কুকঁড়ে যায়। এই রোগের কারণে পাতার উল্লেখযোগ্য অংশে ক্ষত হওয়ায় অনেক সময় সম্পূর্ণ পাতা কালো হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায়। গাছের বৃদ্ধি বাধা গ্রস্থ হয় এবং আক্রমণ বেশি হলে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা যায়।

অশ্বগন্ধার রোগাক্রান্ত গাছ ও পাতা

অশ্বগন্ধার সুস্থ গাছ

ব্যবস্থাপনা

- উচু ও ভাল পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসম্পন্ন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- জমি চাষ বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাতে হবে এতে মাটি শোধন হবে।
- বাণিজ্যিক ফরমালিন (৪০ %) দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি)।
- জমি তৈরির সময় জৈব সারের সাথে নিম জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বাগানে পরিমাণ মত সুষম খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- সুস্থ, সতেজ ও নিরোগ মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে সেগুলো মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের পূর্বে অনুমোদিত ছত্রাক নাশক দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে (প্রতি কেজি বীজে ২-৪ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাক নাশক (ব্যাভিস্টিন, এমকোজিম)।
- রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১% বোঁর্দো মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজনে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশা হলে একই হারে প্রতিরোধক হিসাবে বোঁর্দো মিশ্রণ দেয়া যেতে পারে।
- উপরোক্ত ব্যবস্থা গুলি নেয়ার পরও যদি রোগ দমন না হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে রাসায়নিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট, সানভিট) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে এবং অবশ্যই ছত্রাকনাকের অপেক্ষমান কাল (Residual time) পার হবার পর অশ্বগন্ধা চারা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

চুইঝালের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

সুস্থ চুইঝাল লতা

চুইঝাল (*Pipper chaba*) Piperaceae পরিবারের একটি লতা জাতীয় আরোহী উদ্ভিদ। এটি পান গাছের ন্যায় বাহকের সাহায্যে বেড়ে উঠে। চৈ-ঝাল খুস খুসে কাশি, ব্রংকাইটিস ও হৃৎপিন্ড ঘটিত জটিল রোগের জন্য খুবই উপকারি । বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের লোকজন এটি মসলা হিসেবে, বিশেষ করে বড় মাছ ও মাংসের সাথে রান্না করে খায়। সম্প্রতি দেশের দক্ষিন অঞ্চলের অনেক চাষী ভাই চুইঝাল এর চাষ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয় বাজারেও এর বেশ চাহিদা রয়েছে। যেহেতু ব্যাপক ভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে, তাই চুইঝালেও বিভিন্ন রোগ বালাই এর সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাণ্ড পঁচন এবং শিকড় পঁচন রোগ।

(ক) কাণ্ড পঁচন রোগ (Stem rot)

রোগের কারণ

বছরের যে কোন সময়ে এই রোগ দেখা যায়। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং জলাবদ্ধতার কারণে বর্ষাকালে এ রোগ বেশি দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ রৌদ্রের কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফিউজেরিয়াম অকজিস্পোরাম (*Fusarium oxysporum*) নামক এক ধরণের ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী ।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

কাণ্ড পঁচন চুইঝালের এক ধরণের সংক্রামক রোগ। প্রথমে মাটি সংলগ্ন লতা ও পাতার উপর স্যাঁতস্যাঁতে বা ভিজা ভিজা হালকা বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ধীরে ধীরে কান্ডের দিকে বাড়তে থাকে এবং বাদামী বর্ণ থেকে কাল বর্ণ ধারণ করে। ফলে কাণ্ডের মাঝে মাঝে পঁচন দেখা যায় ও কাণ্ড ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। পরে সম্পূর্ণ গাছটিই মরে যায় এবং চুইঝাল এর উৎপাদন হ্রাস পায়।

রোগাক্রান্ত চুইঝাল

ব্যবস্থাপনা

- পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।
- চুইঝালের গোড়া সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে নিম জৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- চুইঝালের গোড়ায় সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।
- যেহেতু এটি আরোহণের জন্য বাহক প্রয়োজন, তাই বাহকের গোড়া উঁচু করে মাটি দিয়ে চৈ-ঝাল লাগাতে হবে, যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমতে না পারে।
- রোগমুক্ত, সুস্থ ও সবল লতা গাছ থেকে কাটিং সংগ্রহ করতে হবে।
- চারা রোপনের পূর্বে কাটিং গুলো ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে লাগাতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২-৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ব্যাভিস্টিন, এমকোজিম) মিশিয়ে কাটিং গুলো প্রায় ঘন্টাখানিক ডুবিয়ে রেখে তারপর লাগাতে হবে।
- আক্রান্ত লতা শিকড়সহ তুলে মাটিতে পুতে দিতে হবে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ১% ডিটারজেন্ট, পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত গাছের কাণ্ডে ১% বোঁর্দোমিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) পানির সাথে মিশিয়ে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ভাল ভাবে স্প্রে করতে হবে। যেন গাছের কাণ্ড ও লতা-পাতার সমস্ত অংশ এবং গোড়া সংলগ্ন মাটি ভাল ভাবে ভিজে যায়।
- চুইঝালের লতা এ রোগে আক্রান্ত হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (এমকোজিম, ব্যাভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (ডায়থেন এম-৪৫) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

(খ) শিকড় পঁচন রোগ (Root rot)

রোগের কারণ

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ প্রদান, চারার ঘনত্ব খুব বেশী এবং কাদা মাটি যুক্ত নার্সারি বেড/জমি, এবং পানি নিষ্কাশিত হয় না এমন নার্সারিতে বা জমিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে। এ ছাড়া পলিব্যাগে বা চুইঝালের লতার গোড়ায় অতিরিক্ত গোবর সার প্রয়োগ এবং জলাবদ্ধতার জন্যও চারার শিকড়গুলো দ্রুত পচে যায়। অনুকূল পরিবেশে জীবাণু চারা গাছকে আক্রমণ করে এবং দ্রুত পচিয়ে ফেলে। ফিউজেরিয়াম সোলানি (*Fusarium solani*) নামক ছত্রাকই চুইঝালের শিকড় পঁচনের জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

বৃষ্টিপাতের ফলে মাটিতে বিদ্যমান জীবাণু চারা গাছের শিকড়ে আক্রমণ করে এবং শিকড়ে হালকা বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। কচি শিকড়গুলো দ্রুত মরে যায়। ধীরে ধীরে আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং গাছের গোড়া পর্যন্ত পচে যায়। লতা বা কান্ডেও রোগের লক্ষণ দেখা যায়। লতাগুলো ঢলে পড়ে, ফলে সমস্ত গাছ শুকিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে মরে যায়। এতে উৎপাদন ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গাইবান্ধা জেলার সাহাপাড়া ইউনিয়নে গত কয়েক বছর ধরে এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে এবং অধিকাংশ চুইঝাল লতা মারা গেছে।

ব্যবস্থাপনা

- নিরোগ, সুস্থ ও সবল চুই লতা হতে কাটিং সংগ্রহ করতে হবে।
- জমি চাষ বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাতে হবে এতে মাটি শোধন হবে।
- মাটি শোধন করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে সাদা পলিথিন সীট দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে।
- পানি জমে থাকে না এমন স্থানে পরিমাণ মত জৈব সার ও নিম খৈল দিয়ে কাটিং লাগাতে হবে।
- অনুমোদিত ছত্রাক নাশক দিয়ে কাটিং গুলো শোধন করে নিতে হবে।
- নার্সারি বেডে পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে চারা রক্ষা করার জন্য চারার উপরে চালা বা পলিথিনের সীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে অথবা লতা গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অধিক পরিমাণে কাঁচা গোবর ব্যবহার করা যাবে না। নিয়মিত ও পরিমিত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আক্রান্ত লতা শিকড়সহ তুলে মাটিতে পুতে দিতে হবে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগ দেখা মাত্র ১% বোর্দো মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) প্রয়োগ করলে রোগ নিয়ন্ত্রিত হবে।
- উপরোক্ত ব্যবস্থা গুলি নেয়ার পরও রোগ দমন না হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে রাসায়নিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (এমকোজিম, ব্যাভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (ডায়থেন এম-৪৫,) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক প্রয়োগের পর অবশ্যই তার অপেক্ষমান কাল পার হবার পর লতা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ঘৃত কাঞ্চনের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

ঘৃত কাঞ্চন (*Aloe indica* L.) লিলিয়েসি (Liliaceae) পরিবারভুক্ত একটি বর্ষজীবি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছটি দেখতে সুদৃশ্য বলে অনেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বাগান বা টবে রোপণ করে থাকে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। সম্প্রতি দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে নাটোর জেলায় এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে। এটি সাধারণতঃ ৩০-৯০ সে.মি উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর পাতা পুরু, সবুজ, লম্বা ও মোটা, যা গোড়া হতে অগ্রভাগ পর্যন্ত ক্রমশ সরু হয়ে থাকে। পাতার অভ্যন্তরে পিচ্ছিল রসালো জেলির ন্যায় থলথলে পদার্থ থাকে যা স্বাদে তিক্ত। পাতার দুই ধারে অল্প কাঁটা থাকে। ভেষজ উদ্ভিদের জগতে ঘৃত কাঞ্চনের অবস্থান অনেকটাই রাজকুমারীর মত। কোষ্ঠকাঠিন্য, চোখের রোগ, পোড়া ঘা, অগ্নিমন্দা, অর্শরোগ, শিশুর পেটের পীড়া, জন্ডিস বা কামলা, প্লীহা ও যকৃত প্রদাহ, কৃমির উপদ্রব, ঠোটের কোণে বা জিহ্বায় ঘা, পরিপাক শক্তির দুর্বলতা ও বাত-ব্যাধিতে এ উদ্ভিদ খুবই উপকারী। এ ছাড়াও ত্বকের প্রসাধন দ্রব্য ও চুলের শ্যাম্পু তৈরিতে ও এর ব্যবহার হয়। এই গাছে কুঁড়ি/সাকার বের হয় যা পরবর্তীতে কাটিং হিসেবে কাজে লাগে। পাতায় দাগ পড়া এবং খোল পচা এর অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগ গুলি গাছের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়, যেহেতু পাতায় দাগ থাকে তাই এর বাজার মূল্য একেবারেই কমে যায়।

(ক) পাতায় দাগ পড়া রোগ

রোগের কারণ

সাধারণত বছর ব্যাপী এই রোগটি দেখা যায়, তবে শীতকালে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ধারণা করা হয় শীত মৌসুমে পাতার উপরে কুয়াশা পড়ার কারণে অণুজীবের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ফলে রোগের প্রকোপ শুরু হয়। ককলিওবুলাস লুনাটা (*Cochliobolus lunatus*) নামক এক ধরণের ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

পাতার উপরের পৃষ্ঠে বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গোলাকার হালকা বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় হতে থাকে এবং গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি পাতায় প্রায় ২০-২৫টি দাগ দেখা যায়। যে স্থানে দাগ দেখা যায়, সে স্থানে গর্তের ন্যায় সৃষ্টি হয়, অপর পৃষ্ঠেও গর্তটা ভালভাবে বোঝা যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে যায়। অনেক সময় পাতা ঝরে যায়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, এমনকি গাছ মরেও যায়।

ঘৃত কাঞ্চন এর পাতায় দাগ পড়া রোগ

সুস্থ ঘৃত কাঞ্চন চারা

ব্যবস্থাপনা

- জমি কর্ষণ বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কয়েক দিন রোদে রাখতে হবে।
- জমি প্রস্তুতের সময় চুন, নিম খৈল ও জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সুস্থ, নিরোগ মাতৃ গাছ হতে কাটিং/সাকার সংগ্রহ করতে হবে।
- কাটিং গুলো অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২-৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ব্যাভিস্টিন, এমকোজিম) মিশিয়ে কাটিং গুলো প্রায় ঘন্টাখানিক ডুবিয়ে রেখে তারপর লাগাতে হবে।
- মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে সাদা পলিথিন সীট দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে শোধন করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করা যেতে পারে (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি)।
- রোগ দেখা মাত্র আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- শীতের শুরুতে প্রতিরোধক হিসাবে বাগানে ১% বোর্দো-মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) ভালভাবে পানিতে মিশিয়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রান্ত লতা শিকড়সহ তুলে মাটিতে পুতে দিতে হবে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- শীতের শুরুতে প্রতিরোধক হিসাবে বাগানে ১% বোর্দো-মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) ভালভাবে পানিতে মিশিয়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করতে হবে।

(খ) কলার রট/খোলপচা রোগ (Collar rot)

রোগের কারণ

কলার রট বা খোল পচা রোগ ঘৃত কাঞ্চন এর অন্যতম একটি প্রধান রোগ। এর আক্রমণ বেশি হলে চারা মরে যায়। রাইজোফাস স্টোলুনিফার (*Rhizophus stolonifer*) নামক এক ধরণের ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

ঘৃত কাঞ্চন এর মাটি সংলগ্ন পাতাগুলোতে প্রথম দিকে হালকা বাদামী বর্ণের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে এবং হালকা বাদামী বর্ণ হতে গাঢ় বাদামী বর্ণে পরিণত হয়। পাতার নীচের দিকে পচে যায়। রোগাক্রমণ বেশী হলে পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে কাল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ পাতাই পচে যায়।

ঘৃত কাঞ্চন এর কলার রট/খোলপচা রোগ

ব্যবস্থাপনা

- সুস্থ, সবল, রোগ প্রতিরোধক্ষম মাতৃ গাছ হতে কাটিং বা সাকার সংগ্রহ করতে হবে।
- মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে সাদা পলিথিন সীট দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে শোধন করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করা (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি) যেতে পারে।
- সাকার বা কাটিং অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করা উত্তম।
- জমি তৈরি করার সময় মাটির অম্লতা কমানোর জন্য পরিমাণ মত চুন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমিতে জৈব সার পরিমাণ মত ব্যবহার করতে হবে এবং নিম খৈল ও দেয়া যেতে পারে।
- পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- রোগ দেখা মাত্র আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছে ১% বোঁর্দো মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) সমস্ত গাছে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

বাসকের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বাসক (*Adhatoda* zeylanica) একান্থেসি (Acanthaceae) পরিবারের ঘন শাখাযুক্ত চিরসবুজ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর পাতা, ফুল, বাকল (ছাল) ও মুল সব অংশই ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। সাধারণত কফ নিবারক, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস প্রদাহ, হাপানি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, অতিরিক্ত রজঃস্রাব ও শ্লেষ্মাজনিত জ্বর প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় এই উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কম বেশি বাসক দেখা যায়। গত কয়েক বছর ধরে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমুহ বিশেষ করে নাটোর, বগুড়া, গাইবান্ধা ও রংপুরসহ অনেক এলাকায় প্রান্তিক চাষী পর্যায়ে রাস্তার দুই ধারে বাসকের ব্যাপক চাষাবাদ শুরু হয়েছে। চাষাবাদ করতে গিয়ে বাসকে বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই এর সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে উইল্টিং (হঠাৎ আগা হতে মরে যাওয়া) অন্যতম প্রধান রোগ।

বাসকের উইল্টিং রোগ

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

প্রথমে পাতা সজীবতা হারিয়ে হলদে বর্ণের হয়ে শুকিয়ে যায়। কোন কোন সময় পাতার শিরার মাঝখানের জায়গা গুলোতে অসমাকৃতির বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে ঘন হতে থাকে। প্রধান ও শাখামূল পচে যায়। অতি দ্রুত সমস্ত বাগানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য চারা আক্রান্ত হয়ে মড়ক শুরু হয়।

রোগের কারণ

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ প্রদান, অধিক ঘন চারা এবং কাদা মাটি যুক্ত নার্সারির বেড বা জমিতে, যেখানে জলাবদ্ধতা হয় এমন স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব দ্রুত ঘটে। এ ছাড়া জমিতে বা পলিব্যাগে অতিরিক্ত গোবর সার প্রয়োগ করলে চারার শিকড়গুলো দ্রুত পচে মরে যায়। অনুকূল পরিবেশে এ রোগের জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পঁচন রোগ সৃষ্টি করে। ফিউজেরিয়াম সোলানি (*Fusarium solani*) নামক ছত্রাক এই শিকড় পঁচন বা উইল্টিং রোগের জন্য দায়ী।

বাসকের উইল্টিং / শিকড় পঁচন রোগ

সুস্থ বাসক গাছ

ব্যবস্থাপনা

- দ্রুত পানি নিষ্কাশন হয় এমন উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।
- চারা রোপণের পূর্বে মাটি কর্ষণ বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কয়েক দিন (৩/৪ দিন) রোদে শুকাতে হবে।
- সৌর রশ্মির সাহায্যে মাটি শোধন করতে হবে (সাদা পলিথিন সীট দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে শোধন করা যেতে পারে)।
- রোগমুক্ত, সুস্থ ও সবল মাতৃ গাছ হতে কাটিং ব্যবহার করা উত্তম।
- পরিমাণ মত জৈবসার ও নিম খৈল মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হবে।
- চারা রোপণের পূর্বে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করে নিতে হবে (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি)।
- কাটিং রোপণের পূর্বে (অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দিয়ে) শোধন করতে হবে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে চারা রক্ষা করার জন্য চারার উপরে চালা বা পলিথিনের সীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- অধিক বৃষ্টিপাত হলে এবং জলাবদ্ধতা দেখা দিলে ১% বোর্দোমিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) প্রয়োগ করলে চারা রোগ মুক্ত থাকবে।
- উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার পরও যদি রোগ ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত রাসায়নিক ছত্রাকনাশক যেমন, ডায়থেন এম-৪৫ (অনুমোদিত মাত্রায়) ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে সহজেই রোগ নিরাময় হবে।

তুলসির রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

তুলসি (*Ocimum sanctum* L.) লেমিয়েসি (Lamiaceae) পরিবারের গুল্ম জাতীয় একটি সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ। প্রাচীন কাল হতেই তুলসি ঔষধি গাছ হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট এটি অত্যন্ত পবিত্র একটি উদ্ভিদ। তুলসি সাধারণত ৬০-৯০ সে.মি. উচু হয়ে থাকে। এর কাণ্ড সরল, শাখা-প্রশাখা বিপরীত বিন্যস্ত। শাখার প্রান্তদেশে অমসৃণ পাতার চারিদেকে করাতের ন্যায় খাঁজ কাটা থাকে। শরৎ ও হেমন্ত কালে ফুল হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধী উদ্ভিদ। কাশি, খুসখুসে কাশি, শ্বাসকষ্ট, শিশুদের সর্দি কাশি ও যকৃতের গোলযোগে এর রস বিশেষ ফলপ্রদ। তাছাড়া ঘামাচি, চুলকানি, কানের ব্যাথা, বসন্ত, দাদ ও কৃমি রোগে খুবই কার্যকরী। বাংলাদেশে চার ধরনের তুলসির সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বগুড়া, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় বাণিজ্যিকভাবে তুলসির চাষাবাদ হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে তুলসির চা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যার চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচেছ। চাষাবাদ করতে গিয়ে কৃষকরা কতিপয় রোগ-বালাই এর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ

দেশের বিভিন্ন নার্সারিতে তুলসির চারা উত্তোলন করা হচ্ছে এবং অনেক অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। শীতকালে আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রায় সময়ই তুলসিতে এই রোগটি দেখা যায়। এক ধরণের ছত্রাক (*Erysiphe* sp.) পাউডারী মিলডিউ রোগের জন্য দায়ী। পাতায় ছত্রাকের উপস্থিতি সাদা পাউডারের ন্যায় দেখা যায় বলে এ রোগের নাম পাউডারী মিলডিউ। শীতকালে কুঁয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র পরিবেশে এ ছত্রাকের দ্রুত বিস্তার ঘটে। তবে বছরের অন্যান্য সময়ও এই রোগের লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

চারা থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক তুলসি গাছে সবুজ পাতায় সাদা পাউডারের ন্যায় আবরণ দেখা যায়। এই রোগটিকে দূর হতে খুব সহজেই চেনা যায়। পাতার নীচের চেয়ে উপরের অংশে ছত্রাকের উপস্থিতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। এতে পাতার সবুজ রং সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। এ ছত্রাকের আক্রমণে পত্র ফলক কুচকে যায় ও কাল হয়ে শুকিয়ে যায়। শীর্ষ মুকুলসহ ডাল পালাও ছত্রাকের আবরণে ঢাকা পড়ে। ফলে চারার উপরের দিকের ডাল-পালা শুকিয়ে মরে যায়। এতে চারার বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং উৎপাদন কমে যায়

তুলসির পাউডারি মিলডিউ রোগ

তুলসির পাউডারি মিলডিউ রোগ

ব্যবস্থাপনা

- লাঙ্গল বা কোদাল দিয়ে কর্ষণ করে মাটি ৫/৭ দিন রোদে শুকাতে হবে।
- মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে সাদা পলিথিন সীট দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে শোধন করে নিতে হবে।
- চারা রোপণের পূর্বে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করে নিতে হবে (১ ভাগ ফরমালিন ও ১০ ভাগ পানি)।
- রোগের প্রথম দিকে আক্রান্ত পাতা ছিড়ে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- কুয়াশাচ্ছন্ন ও আর্দ্র পরিবেশে প্রয়োজনে চারা গুলো চালা বা পলিথিন সীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- আক্রমণ বেশী হলে ১% বোঁর্দো মিশ্রণ (অনুমোদিত মাত্রায়) গাছের সমস্ত পাতায় এবং গোড়া সংলগ্ন মাটিতে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে, এতে রোগের প্রকোপ কমে যাবে।
- উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার পরও যদি রোগ ছড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত কপার জাতীয় রাসায়নিক ছত্রাকনাশক (সানভিট, কুপ্রাভিট, চ্যাম্পিয়ন) অথবা সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (থিয়োভিট, রিডোমিল্ড গোল্ড) ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে গাছের পাতা, কান্ড ও গোড়া ভিজাতে হবে। এভাবে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে।

বনাঞ্চলে মৌমাছি পালন

ভূমিকা

আদিকাল থেকে মৌমাছি মানুষের নিকট অতি পরিচিত এক প্রকার ক্ষুদ্র, পরিশ্রমী ও উপকারী পতঙ্গ। সাধারণত দলবদ্ধভাবে বাস করে বলে এদেরকে সামাজিক পতঙ্গ বলা হয়। মৌমাছি থেকে আমরা মধু ও মোম পাই। এছাড়া উন্নত বিশ্বে মৌমাছি থেকে রয়াল জেলী, প্রপোলিস ও মৌবিষ সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে বনজ, ফলদ ও কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। আর এ জন্যই মৌমাছিরা মানুষের ও গাছ-পালার পরম বন্ধু। কোন কোন প্রকার মৌমাছি বাক্সবন্দী করে লালন-পালন বা চাষ করা যায় এবং অধিকতর লাভবান হওয়া যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলে এবং এর আশে-পাশে বসবাসরত অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৌমাছি চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌমাছির প্রজাতি

স্বভাবগতভাবে মৌমাছিরা প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে। আমাদের দেশে সাধারণত তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়, যথা : (১) পাহাড়ী মৌমাছি *Apis dorsata*, (২) ভারতীয় মৌমাছি *Apis cerana* ও (৩) ক্ষুদে মৌমাছি *Apis florea*।

পাহাড়ী মৌমাছি : এরা আকারে সবচেয়ে বড়। বড় বড় গাছের ডালে, পাহাড়ের গায়ে, ঘরের কার্ণিশে প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানে এরা চাক বাঁধে। একটি দল একটি চাক তৈরি করে। চাক আকারে অনেক বড় হয়। চাকপ্রতি মধুর উৎপাদন প্রতিবারে গড়ে প্রায় ১০ কেজি। এরা হিংস্র ও এদের স্থানান্তরের অভ্যাস বেশি। এরা পোষ মানে না। তাই বাক্সে লালন-পালন করা যায় না। সুন্দরবনে এদের প্রচুর দেখা যায়।

ভারতীয় মৌমাছি : এরা আকারে মাঝারি ধরনের। অন্ধকার বা আড়াল করা স্থান যথা মাটির গর্ত, গাছের ফোকর, দেওয়ালের ফাটল, পরিত্যক্ত কলস, টিন, আলমারি, ইটের স্তুপ ইত্যাদি স্থানে এরা চাক বাঁধে। একটি দল পাশাপাশি সমান্তরাল একাধিক চাক তৈরি করে। চাক মাঝারি ধরনের। একটি চাকে প্রতিবারে গড়ে প্রায় ৪ কেজি মধু পাওয়া যায়। এরা শান্ত প্রকৃতির এবং উৎপীড়িত না হলে আক্রমণ করে না। এ জন্যই এদের বাক্সবন্দী করে লালন-পালন করা যায়।

ক্ষুদে মৌমাছি : এরা আকারে সবচেয়ে ছোট। এরা ঝোপ জাতীয় গাছের ডালে, পাতায় ও শুকনো কাঠি প্রভৃতিতে চাক বাঁধে। একটি দল একটিমাত্র চাক তৈরি করে। চাকের আকার খুব ছোট, হাতের মুঠির সমান। চাকপ্রতি মধুর উৎপাদন প্রতিবারে গড়ে প্রায় ২০০ গ্রাম। এরা খুব শান্ত প্রকৃতির, তবে একস্থানে বেশি দিন থাকে না।

মৌমাছির পরিবার

আকার ভেদে একটি মৌচাকে প্রায় ২০ হাজার থেকে ৯০ হাজার মৌমাছি থাকে। কিন্তু দেহের বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণে এরা এক নয়। একটি মৌচাকে বা পরিবারে তিন শ্রেণীর মৌমাছি থাকে, যথা : (১) রাণী, (২) পুরুষ ও (৩) শ্রমিক মৌমাছি।

রাণী মৌমাছি : রাণী মৌমাছি সবচেয়ে বড় আকৃতির। এর পেট বেশ লম্বা ও প্রশস্ত এবং ডানা দুটো ছোট। এর হুল আছে। একটি চাকে একটিমাত্র রাণী মৌমাছি থাকে। রাণী বিহীন মৌচাক টিকে না। রাণী মারা গেলে অথবা চলে গেলে ঐ চাকে

নতুন একটি রাণী উৎপন্ন হলেই কেবল চাকটি চালু থাকে। সত্যিকার অর্থে রাণীই চাকে একমাত্র স্ত্রী মৌমাছি। এর একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। রাণী মৌমাছি জীবনে একবারই মাত্র একটি পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে মিলিত হয়। জন্ম নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন রাণী কিছু পুরুষ ও শ্রমিক ও মৌমাছি নিয়ে আকাশে উড়ে যায়। এটিই রাণীর 'বাসর যাত্রা'। মিলন শেষে রাণী শ্রমিকসহ চাকে ফিরে আসে। জীবনে একবার মিলিত হলেও রাণী পর্যাপ্ত শুক্রাণু জমা রাখে তার দেহের ভিতর 'শুক্রধানীতে'। রাণী দু'ধরনের ডিম পাড়ে-নিষিক্ত ডিম (শুক্রাণু মিশানো) ও অনিষিক্ত ডিম (শুক্রাণু অমিশানো)। রাণী কোন ধরনের ডিম পাড়বে তা তার ইচ্ছাধীন। নতুন রাণী তৈরি হবে নিষিক্ত ডিম থেকে। শ্রমিক মৌমাছির তত্ত্বাবধানে এক বিশেষ ধরনের খাবার (রয়াল জেলী বা 'রাজসুধা') খেয়ে নতুন রাণী তৈরি হয়। এ খাবারের জন্য সে পরবর্তীতে ডিম পাড়তে সক্ষম হয়, শরীর অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়। একটি রাণী মৌমাছির আয়ুষ্কাল প্রায় ২/৩ বছর।

পুরুষ মৌমাছি : এরা মধ্যম আকৃতির। এদের চোখ বড়। কিন্তু এদের হুল নেই। এদের সংখ্যা খুব সামান্য, ১০/১৫টি বা তার কিছু বেশি। এদের একমাত্র কাজ রাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। এরা খুব অলস প্রকৃতির। এমনকি এরা অনেক সময় নিজের খাবার নিজেরা গ্রহণ করে না। শ্রমিকেরা খাইয়ে দেয়। এদের জন্ম অনিষিক্ত ডিম থেকে। রাণীর সঙ্গে শুধুমাত্র একটি পুরুষ মৌমাছি মিলিতি হতে সক্ষম হয়। তবে মিলিত হওয়ার পর সে পুরুষটি মারা যায়। অন্যান্য পুরুষেরাও আর চাকে ফিরে আসতে পারে না, হয় শ্রমিকের হাতে মারা পড়ে অথবা বিতাড়িত হয়। পুরুষ মৌমাছির আয়ুষ্কাল প্রায় দেড় মাস।

শ্রমিক মৌমাছি : এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির। এদের চোখ ছোট, কিন্তু হুল আছে। রাণী ও পুরুষ বাদে অবশিষ্ট সকল সদস্যই শ্রমিক মৌমাছি। এরাই নানা দলে ভাগ হয়ে চাকের যাবতীয় কাজ (যথা চাক নির্মাণ করা, ফুলের মিষ্টি রস ও পরাগরেণু সংগ্রহ করা, মধু তৈরি করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো ও সেবা-যত্ন করা, চাকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, শত্রুর আক্রমণ থেকে চাক রক্ষা করা, চাকে বাতাস দেয়া, চাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি) সম্পন্ন করে। শ্রমিকেরা যদিও স্ত্রী মৌমাছি, এদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা নেই, এরা বন্ধ্যা। এদের জন্ম নিষিক্ত ডিম থেকে। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় এক মাস।

মৌমাছির চাক

মৌমাছির চাক মোম দিয়ে তৈরি। চাক ছোট ছোট খোপবিশিষ্ট। খোপগুলো সারি বেঁধে তৈরি। প্রতিটি খোপে থাকে ছয়টি দেওয়াল। সবগুলো খোপ হুবহু একই রকম দেখতে। তবে শিশু শ্রমিকের ও মধু জমানোর খোপগুলো পরিমাপে একটু ছোট, শিশু পরুষদের একটু বড় এবং শিশু রাণীর বেশ বড় ও লম্বাটে। শিশুদের খোপগুলো সাধারণত চাকের নিচের দিকে ও মধু জমানোর খোপগুলো উপরের দিকে থাকে। শিশু রাণীর খোপ থাকে সাধারণত চাকের নিচের দিকের কিনারায়। ডিম পাড়ার পূর্বে রাণী দেখে নেয় খোপের মাপ, যাতে নির্দিষ্ট মাপের খোপে নির্দিষ্ট প্রকারের ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুককীট বা শিশু মৌমাছি বেরিয়ে আসে। শ্রমিক মৌমাছি এসব শিশু মৌমাছিদের প্রথম তিন দিন মধু ও পরাগরেণুর পাশাপাশি 'রাজসুধা' খেতে দেয়। 'রাজসুধা' তৈরি হয় শ্রমিক মৌমাছির মুখের এক বিশেষ গ্রন্থি থেকে। এরপর 'রাজসুধা' শুধু ভাবী রাণীকে খেতে দেয়। অন্যদেরকে খেতে দেয় শুধু মধু ও পরাগরেণু। প্রায় ৮/৯ দিন পর শ্রমিকের সব শুককীটের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এ বন্ধ খোপের মধ্যে শুককীট মুককীটে বা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়। ভাবী রাণীর ক্ষেত্রে খোপে বন্ধ থাকার সময় প্রায় ৭ দিন, শ্রমিকের ক্ষেত্রে ১২ দিন ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৫ দিন। এরপর মুককীট পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয় এবং খোপের মুখ কেটে বেরিয়ে আসে।

মধু ও মোম

মধু একান্তভাবে মৌমাছির তৈরি এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য। শ্রমিক মৌমাছিরা ফুলের মিষ্টি রস শুষে নেয় এবং তা জমা করে পাকস্থলীর উপরে এক বিশেষ অঙ্গে যাকে মধুথলি বলে। ফুলের মিষ্টি রস মধুথলিতে জমা করার সময় এর সঙ্গে লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন উৎসেচক মেশায়। এর ফলে মিষ্টি রস পরিবর্তিত হয়ে আংশিক মধু তৈরি হয়, যা চাকে এনে ঢেলে দেয় মধু রাখার খোপগুলোতে। তরুণ শ্রমিক মৌমাছিরা এ সময় ছুটে এসে ঐ মধু আবার মুখে ভরে এবং তাদের লালার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করে আসল মধু এবং তা জমা করে খোপে। শ্রমিক মৌমাছিরা জোরে ডানা নেড়ে খোপে রক্ষিত মধু থেকে বাড়তি পানি সরিয়ে দেয়। ফলে এক সময় ফুলের মিষ্টি রস হয়ে যায় ঘন মধু, যা জমা রাখে নিজেদের ও বাচ্চাদের খাবার হিসেবে। মধু জমা রাখার পর খোপগুলোর মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। শ্রমিক মৌমাছির পেটের তলায় পকেটের মত ভাঁজে থাকে মোমগ্রন্থি। সেখানে তৈরি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতের মত মোম কণা। এ মোম দিয়ে শ্রমিকেরা বানায় বাসা।

মৌমাছি পালনের বাক্স

আমাদের দেশে প্রধানত ভারতীয় মৌমাছি লালন-পালন করা হয়। এ মৌমাছির বাক্স সাধারণত কাঁঠাল কাঠের তৈরি এবং ২৮.৬ সে. মি. x ২৭.৭ সে. মি. x ১৭.৪ সে. মি. মাপবিশিষ্ট হয়। এর নিচের দিকে খোলা, যা একটি কাঠের পাটাতনের উপর বসানো থাকে। বাক্সের উপর কাঠের একটি ঢাকনা থাকে। এতে বাতাস চলাচলের জন্য জাল দ্বারা আবৃত একটি ছিদ্র থাকে। ঢাকনার নিচে সাতটি সমান্তরাল কাঠের ফ্রেম থাকে। এ ফ্রেমে মৌমাছিরা চাক বাঁধে। এ প্রকোষ্ঠের উপর ফ্রেমসহ আরেকটি প্রকোষ্ঠ বসানো থাকে। উপরের প্রকোষ্ঠকে মধু প্রকোষ্ঠ ও নিচের প্রকোষ্ঠকে বাচ্চা প্রকোষ্ঠ বলে। বাক্সের নিচে এক দিকে একটি ছোট ছিদ্র থাকে, যার ভিতর দিয়ে কেবলমাত্র শ্রমিক মৌমাছি যাতায়াত করতে পারে।

বাক্স রাখার স্থান

যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু, নির্জন, ধোঁয়া অথবা গ্যাসমুক্ত, শুকনো এবং ছায়াযুক্ত এবং আশে-পাশে পর্যাপ্ত ফুল সমৃদ্ধ গাছ-গাছড়া আছে সেখানে মৌমাছির বাক্স বসাতে হয়।

মৌমাছি সংগ্রহ ও কৃত্রিম খাবার

প্রকৃতি থেকে ভারতীয় মৌমাছি (রাণী ও কিছু শ্রমিক) সংগ্রহ করে অথবা প্রতিষ্ঠিত মৌচাষীর নিকট থেকে ক্রয় করে মৌচাষ কার্যক্রম আরম্ভ করা যায়। বাক্সবন্দীর প্রথম ৩/৪ দিন কৃত্রিম খাবার যথা চিনির ঘন সরবত বা সিরাপ দেবার প্রয়োজন হয়। এরপর মৌমাছিরা নিজেদের খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করে থাকে। কখনও কখনও পরিবেশে খাবার ঘাটতি পড়লেও কৃত্রিম খাবার দেবার প্রয়োজন হয়।

মৌমাছির উপযোগী গাছ-পালা

মৌমাছির জন্য ফুলের মিষ্টি রস ও পরাগরেণু সমৃদ্ধ গাছ-পালার প্রয়োজন। শীতকালে এ ধরনের গাছ-পালা প্রচুর দেখা যায়। আবার বর্ষাকালে এ ধরনের গাছ-পালার ঘাটতি দেখা যায়। সারা বছর মিষ্টি রস ও পরাগরেণু সমৃদ্ধ ফুল প্রাপ্তি যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্য নিম্নলিখিত গাছ-পালা মৌমাছি পালন এলাকার আশে-পাশে (২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে) স্থানভেদে রোপণ বা চাষ করা যেতে পারে।

আম, জাম, কলা, লিচু, পেয়ারা, ডালিম, নারিকেল, বেল, লেবু, কমলা লেবু, বাতাবি লেবু, তেঁতুল, খেজুর, তাল, সুপারি, জলপাই, বড়ই (কুল), মিষ্টি আলু, সজিনা, পেঁপে, শশা, ফুটি, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙে, চিচিংঙ্গা, টমেটো, বেগুন, ঢেঢ়শ, ধনে, পিয়াঁজ, মরিচ, তামাক, খেসারি, মটরশুটি, বরবটি, অড়হর, ছোলা, সয়াবিন, ভূট্টা, রাই, সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, তুলসী, কৃষ্ণচূড়া, লজ্জাবতী, জারুল, শিশু, নিম, অর্জুন, তূর্ণ, বাসক, হিজল, মান্দার, হরিতকী, আমলকি, কাল কড়ই, শিমূল, কার্পাস, বরুণ, সোনালু, বাবলা, খৈয়া-বাবলা, পিটালি, পলাশ, কাজু

বাদাম, ছাতিম, রাবার, ইউক্যালিপ্টাস, কুম্ভি, মেহগনি, ইপিল-ইপিল, হলদু, সেগুন, খলসি, গেওয়া, বাইন, গরান, কেওড়া, ছইলা, করঞ্জা, কাঁকড়া, রাইজোফোরা ইত্যাদি।

মৌমাছির ঝাঁক বাঁধা

সাধারণত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মৌমাছির ঝাঁক বাঁধার প্রবণতা দেখা যায়। বাক্সে মৌমাছির সংখ্যা বেড়ে গেলে, খাদ্যাভাব হলে, বেশি বিরক্ত করলে অথবা অন্যান্য প্রতিকূল পরিবেশের জন্য মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। পুরাতন রাণী উড়ে যাবার পূর্বে শ্রমিকরা চাকে প্রথমে ভাবী পুরুষ ও পরে ভাবী রাণী মৌমাছির খোপ তৈরি করে। এগুলো খুঁজে বের করে সাবধানে কেটে ফেলে দিলে ঝাঁক বাঁধা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফ্রেমের চাকে নতুন রাণীর খোপ দেখা গেলে সেই ফ্রেম কিছু মৌমাছিসহ নতুন বাক্সে স্থানান্তর করে নতুন চাক তৈরি করা যায়।

মৌমাছির শত্রু

আমাদের দেশে মোমের মথ পোকা মৌমাছির প্রধান শত্রু। এ পোকা চাকে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে মোম খায়। কখনও কখনও থাই স্যাক ব্রুড ভাইরাস দ্বারা মৌমাছি আক্রান্ত হয়ে চাক ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়া নানাবিধ পাখি, মাকড়শা, টিকটিকি, পিঁপড়া, ব্যাঙ ইত্যাদি মৌমাছির শত্রু। এগুলো থেকে মৌমাছি রক্ষা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয়।

মধু সংগ্রহ

প্রকৃতি থেকে সংগ্রহীত মধু যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। কারণ সংগ্রহ করার সময় আস্ত চাক হাত দিয়ে চিপে মধু বের করা হয়। এ মধুতে মৌমাছির দেহাংশ ও বর্জ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এছাড়া এ ধরনের মধু অল্প দিনের মধ্যে পচে নষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে বাক্সে লালন-পালন করা মৌমাছির চাক থেকে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু বের করা যায়। এতে চাক থেকে শুধু মধু বের হয়ে আসে, অথচ চাক নষ্ট হয় না এবং তা আবার ব্যবহার করা যায়। অনেক মৌচাষীর ব্যবহারের জন্য একটি যন্ত্রই যথেষ্ট।

মৌমাছি পালনের উপকারী দিকসমূহ

ক) দেশে খাঁটি মধুর চাহিদা পূরণ করে পুষ্টিহীনতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ মধু শর্করা জাতীয় তাৎক্ষণিক শক্তি যোগানো খাদ্য, যা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, এনজাইম ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ।

খ) মধু রোগ (যথাঃ সর্দি, কাশি, বাত, ব্যথা ইত্যাদি) নিরাময়ক, রোগ প্রতিরোধক ও জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়।

গ) মোম, মোমবাতি, প্রসাধন (কোল্ডক্রীম, ভ্যানিংশক্রীম, সেভিংক্রীম, স্নো ইত্যাদি), ঔষধ (বিভিন্ন মলম তৈরি), খেলনা ও কাষ্ঠ শিল্পে (পোলিশিং) ব্যবহার হয়ে থাকে।

ঘ) মধু ও মোম বিক্রয় করে বাড়তি আয়ের সংস্থানের মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে যা সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করে।

ঙ) মৌমাছি চাষ এবং এ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গ্রামীণ বেকার সমস্যার সমাধানে অবদান রাখে।

চ) ফুলের পরাগায়নের মাধ্যমে কৃষিজ, ফলদ ও বনজ গাছ-পালার ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি করে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ছ) মৌমাছি চাষ একটি পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন কর্মসূচী, যাতে স্বল্প শ্রম ও পুঁজি ছাড়া কোন বাড়তি ভূমির প্রয়োজন হয় না। এমন কি গৃহপালিত পশু-পাখি লালন-পালনে যে খাবার দেবার প্রয়োজন হয়, মৌমাছির তেমন কোন খাবারের প্রয়োজনও নেই। এরা নিজেদের খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করে।

জ) মৌমাছির খাদ্যের উৎস বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কৃষিজ, ফলদ ও বনজ গাছ-পালার চাষ বা রোপণের মাধ্যমে উদ্ভিদ সম্পদ বাড়িয়ে পরিবেশ উন্নয়নে সাহায্য করে।

মৌমাছির পালনের আয়-ব্যয়

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে মৌমাছি পালন করলে এবং এলাকায় পর্যাপ্ত সহায়ক গাছ-পালা থাকলে একটি বাক্স থেকে মধু ঋতুতে (শীতকালে) ৭-৮ কেজি এবং বছরে ১৭-১৮ কেজি খাঁটি মধু সংগ্রহ করা যায়। কেবলমাত্র উৎপাদিত মধুর উপর ভিত্তি করে বাক্স প্রতি প্রথম বছরের আয়-ব্যয়ের একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নরূপ (বর্তমান বাজার দর হিসেবে) :

মৌমাছি পালনে আয়

উৎপাদিত মধু	= ১৭ কেজি
প্রতি কেজি টাকা ৭০০/- হিসেবে	
মোট (১৭ × ৭০০)	= ১১,৯০০/-

মৌমাছি পালনে ব্যয়

মৌমাছির বাক্সের দাম	= ২২০০/-
মৌকলোনীর দাম	= ২৫০০/-
মৌমাছির কৃত্রিম খাদ্য	= ৩০০/-
অন্যান্য	= ২০০/-
মোট	= ৫২০০/-

অতএব,

লাভ: = (আয় - ব্যয়)

= (১১৯০০- ৫২০০) টাকা

= ৬৭০০ টাকা

উপসংহার

বাংলাদেশে মৌমাছি চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া, গাছ-পালা ও পরিবেশ বিদ্যমান। বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও আশে-পাশের সকল এলাকায় মৌমাছির চাষ করা যায়। বাক্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী একবার ক্রয় করলে প্রায় ১০ বছর তা ব্যবহার করা যায়। তাই আমরা সকলে মৌমাছির চাষ বাড়িয়ে খাঁটি মধু ও মোম উৎপাদনসহ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও পরিবেশ উন্নয়নে এগিয়ে আসি।

স্বল্প পুজিতে মধু চাষ করুন, আর্থিক ভাবে লাভবান হন

বন ইনভেন্টরী বিভাগ

বনজ উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধি (Growth) এবং ফলন (Yield) মডেল

বন ও বনজ সম্পদের লাগসই ব্যবস্থাপনা, চাহিদা ও যোগানের সঠিক তথ্য জানার জন্য বৃক্ষের বর্ধনহার, উৎপাদনহার, আয়তন, বায়োমাস ও কার্বন ধারণের পরিমাণ জানা দরকার। বন ও বনজ সম্পদের বর্তমান ও ভবিষৎ অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সমুহ বন ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বনের উৎপাদন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদি ইনভেন্টরীর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। বন ব্যবস্থাপনার কৌশল, বিদ্যমান স্টকের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং ফলনের উপর নির্ভরশীল। ফলন অনুমান (Yield Prediction) একটি নির্দিষ্ট বয়সে একটি নির্দিষ্ট বনের বিদ্যমান স্টকের উৎপাদন তথ্য প্রদান করে। ফলে একজন ব্যবস্থাপক বনের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের কাঠের সর্বাধিক উপাদন নির্ধারণ করতে সক্ষম হন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রহণ করতে পারেন। বনের বৃদ্ধি (Growth) এবং ফলন (Yield) গাণিতিক মডেল উদ্ভাবনের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। গাণিতিক মডেল এমন একটি পদ্ধতি যা বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য উপাত্তের শুদ্ধতা পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে গ্রোথ প্যারামিটার (Grotwth parameter) সমুহের সংখ্যা তাত্ত্বিক মান নির্ণয় করা হয়। ইহা এক বা একাধিক সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা যায়।

বন ও বনজ সম্পদের সঠিক ও লাগসই ব্যবস্থাপনার জন্য বন ইনভেন্টরী বিভাগ উক্ত বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। অত্র বিভাগ স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন লোকেশনে গুরুত্বপূর্ন ৪২ প্রজাতির বৃক্ষের আয়তন নির্ণয়ের জন্য ৭২৬ টি এলোমেট্রিক (Allometric) মডেল, ১৬ প্রজাতির বৃক্ষের ১৪১ টি বৃদ্ধি (Growth) এবং ফলন (Yield) মডেল এবং ৪ প্রজাতির বৃক্ষের বায়োমাস নির্ণয়ের ৪০ টি এলোমেট্রিক মডেল উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত ভ্যলিউম ইকুয়েশন (Volume Equation) সমুহের সাহায্যে গাছের শুধু বেড় অথবা বেড় ও উচ্চতা জানা থাকলে প্রতিটি গাছের মোট আয়তন বা একর প্রতি মোট উৎপাদন এবং কার্বন ধারণের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গ্রোথ মডেলের (Growth Model) সাহায্যে শুধু বয়স জানা থাকলে বর্ধনহার ও উৎপাদন হার নির্ণয় করা যায়। বন বিভাগ, এনজিও এবং ব্যক্তি মালিকনার বাগান মালিকগণ গাছের মোট উৎপাদন নির্ণয় করার জন্য উদ্ধাবিত মডেল সমুহ ব্যবহার করে থাকেন। উদ্ভাবনকৃত বৃদ্ধি (Growth) এবং ফলন (Yield) মডেলে সাহায্যে ইতোমধ্যে নির্ণীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষের উৎপাদন, বর্ধনহার ও অর্থিক আবর্তন কাল নিম্নে দেয়া হল:

গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষের বয়স ভিত্তিক উৎপাদন, বর্ধনহার ও আবর্তন কাল

ক্রমিক নং	প্রজাতি	উপযোগী স্থান	বয়স (বছর)	বেড় (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	উৎপাদন প্রতিগাছ(ঘনফুট)	আর্থিক আবর্তন কাল(বছর)
১	আকাশমনি	পাহাড়ের চুড়া	১৫	১.২	৪৭.২	১০.৩	১০
		পাহাড়ের পাদদেশ	১৫	১.৪	৬৫.৬	১২.৬	১০
		বেড়িবাঁধ	১৫	২.৩	৪৩.০	১১.৭	১০
২	ম্যানজিয়াম	পাহাড়ের চুড়া	১২	২.০	৫৩.২	১৭.৩	১২
		পাহাড়ের পাদদেশ	১২	২.২	৬২.৩	২১.৯	১২
৩	ইউক্যালিপটাস	পাহাড়ের চুড়া	১৫	১.৮	৬৮.৯	৯.৪	১০
		পাহাড়ের পাদদেশ	১৫	২.১	৬৯.৯	২১.৯	১০
		ক্ষেতের আইল	১৫	২.৭	৬১.৭	১৬.৭	১০
৪	গামার	পাহাড়ের চুড়া	১৫	১.৫	৪১.৭	৯.৭	৭
		পাহাড়ের পাদদেশ	১৫	১.৭	৪৭.২	১৪.৫	৭
৫	মেহগনি	বেড়িবাঁধ	১৫	১.২	৫১.৪	৫.৬	৪৫
		উডলট	১৫	২.০	৪৯.৫	৫.৯	৪৫
		ক্ষেতের আইল	১৫	২.১	৪৫.৩	৪.০	৪৫
		বসতবাড়ি	১৫	২.০	৪৩.৩	৫.৩	৪৫
৬	কড়ই	বেড়িবাঁধ	১৫	২.৩	৪৩.০	১১.৭	১৫
		ক্ষেতের আইল	১৫	৩.১	৩৮.১	১৯.০	১৫
		বসতবাড়ি	১৫	২.৫	৪৫.৮	৮.৭	১৫
৭	রেইনট্রি	বেড়িবাঁধ	১৫	৪.৫	৪২.৩	৩০.৭	২০
		বসতবাড়ি	১৫	৪.১	৩৯.৭	২১.১	২০
৮	শিশু	বেড়িবাঁধ	১৫	২.৮	৩৮.১	৮.৭	-
		উডলট	১৫	২.৭	৪৮.২	৮.১	-
		ক্ষেতের আইল	১৫	২.৫	৪৬.৩	৬.৮	-
৯	মালাকানা	পাহাড়ের চুড়া	১২	১.৫	৪২.৭	১৩.৪	৭
		পাহাড়ের পাদদেশ	১২	২.০	৫৫.৮	১৪.৮	-
১০	ঘোড়ানিম	ক্ষেতের আইল	১৫	৩.২	৪২	১৩.৮	-
১১	বাবলা	বেড়িবাঁধ	১৫	১.৯	৩১.৮	৬.০	-
১২	কেওড়া	উপকূলীয় চর	১৫	১.৩	৩৯.৭	৪.৩	১৫
১৩	আম	বসতবাড়ি	১৫	২.২	৪৯.২	৭.১	-
১৪	জাম	বসতবাড়ি	১৫	১.৭	৩১.০	৩.৪	-
১৫	কাঁঠাল	বসতবাড়ি	১৫	২.০	৩২.৫	৪.৬	-
১৬	নিম	বসতবাড়ি	১৫	১.৪	৩৬.৯	২.৭	-
১৭	রাজকড়ই	বসতবাড়ি	১৫	২.৮	৪৪.৯	-	-
১৮	শিমুল	বসতবাড়ি	১৫	২.১	৫৩.২	৭.৭	-

উপকূলীয় চর এবং পাহাড়ের ব্লক প্ল্যান্টেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষের উৎপাদন ও আবর্তন কাল

ক্রমিক নং	প্রজাতি	উপযোগী স্থান	উৎপাদন প্রতি হেক্টরে (ঘনফুট)	আর্থিক আবর্তন কাল(বছর)
১৯	বাইন	উপকূলীয় চর	৩০২০	১৫
২০	চাপালিশ	পাহাড়ের ব্লক	৩২৮৫	৪৫
২১	ছাতিয়ান	প্লান্টেশনে	২৯১৪	৫০
২২	ঢাকিজাম		২৮৬১	৪৫
২৩	সেগুন		২৫৪৩	৪৫
২৪	শাল		২৫৯৬	৪৫
২৫	জারুল		২২২৫	৫০
২৬	কদম		৪২১২	১২

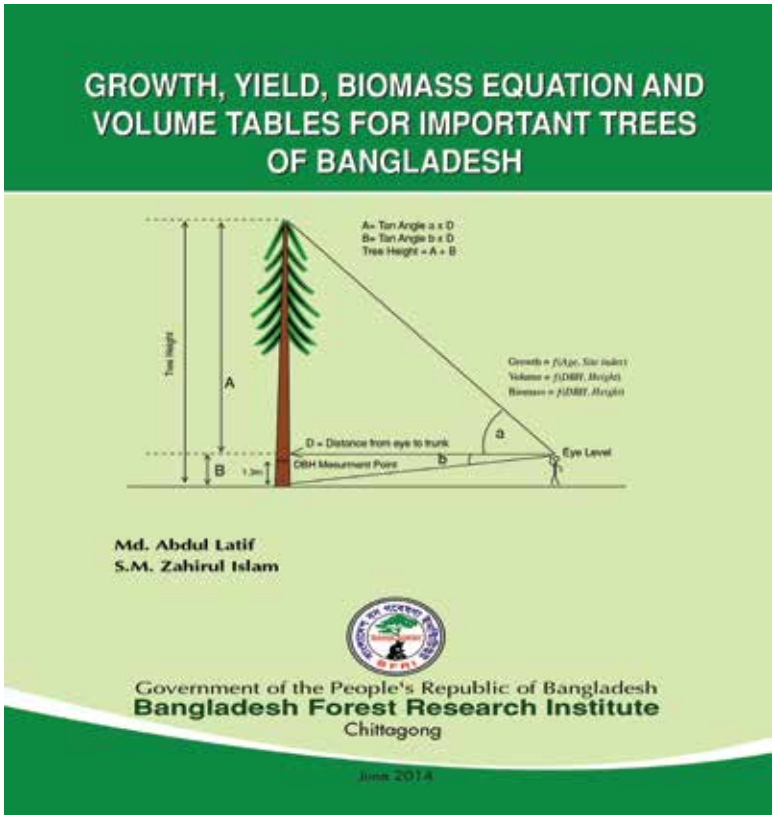

সহজ পদ্ধতিতে রাবার কাঠের পরিমাণ নির্ণয়

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাবারের ভূমিকা অপরিসীম। স্যান্ডেল, জুতা, সাইকেল, রিক্সা, গাড়ী ইত্যাদির টায়ার, উড়োজাহাজের চাকা, বিভিন্ন প্রকার খেলনা- প্রভৃতি রাবার দিয়ে তৈরি হয়। রাবার কাঠ পূর্বে প্যাকিং বাক্সসহ বিভিন্ন কাজে ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে বিএফআরআই রাবার গাছ থেকে টেকসই আসবাব পত্র তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

আদর্শ কাঠ বলে বিবেচিত সেগুন সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাবার কাঠ মাঝারি শক্তি সম্পন্ন কাঠ। সুতরাং রাবার কাঠ এখন আর স্বল্প মূল্যের কাঠ নয়। বিএফআইডিসি এর তথ্য মতে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি ব্যবহার করে (সিজনকৃত ও ট্রিটেড) প্রতি সিএফটি রাবার কাঠের বাজার মূল্য ১২০০/=। ফলে বর্তমানে সৃজিত বাগান ও প্রাকৃতিক বাগানে কি পরিমাণ রাবার কাঠের মজুত আছে তা জানা আবশ্যক।

পুন:রোপণের জন্য আবর্তন কাল শেষে ক্লিয়ার ফেলিং এর ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন, টিম্বার ভলিউম, কার্বনের পরিমাণ (Carbon Content) নির্ণয় করা প্রয়োজন। ভলিউম টেবল রাবার বাগানের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার, গবেষণা পরিকল্পনা / প্রস্তাবনা এবং কাঠের পরিমাণ নির্ণয়ে সহায়ক। সে উদ্দেশ্যে বন ইনভেন্টরী বিভাগ ২০১৪ সালে রাবার গাছের আয়তন নির্ণয়ের গাণিতিক মডেল উদ্ভাবন করেছে যার মাধ্যমে কাঠের মোট আয়তন (Total Volume) নিরূপণ করা যায়। খুব সহজ পদ্ধতিতে নির্ণীত মডেল ব্যবহার করে রাবার গাছের আয়তন (Volum) বের করা যায়, তা নিম্নে দেওয়া হল।

A. Two Way Volume Measurement:

বুক সমান উচ্চতায় একটি গাছের বেড় ও মোট উচ্চতা জানা থাকলেই গাছটিতে কি পরিমাণ কাঠ আছে তা জানা যাবে। যেমন- একটি গাছের বুক উচ্চতায় বেড় (G) যদি ৯০ সে.মি. হয় এবং গাছের উচ্চতা (H) ২০ মি. হয় তবে তার আয়তন বের করার সূত্র নিম্নরূপঃ

$$\ln(Vob) = -11.2768+1.8795 \ln(G)+0.6928 \ln(H).$$

$$= - 11.2768+1.8795 \ln(90)+0.6928 \ln(20)$$

$$= - 0.7442$$

আয়তন (V) = Exp (-0.7442)

$$= 0.475 \text{ m}^3.$$

ln = e **ভিত্তিক** log, Vob = Volume over bark, G= Girth (**বুক উচ্চতায় গাছের বেড়**), H= Height (**উচ্চতা**)।

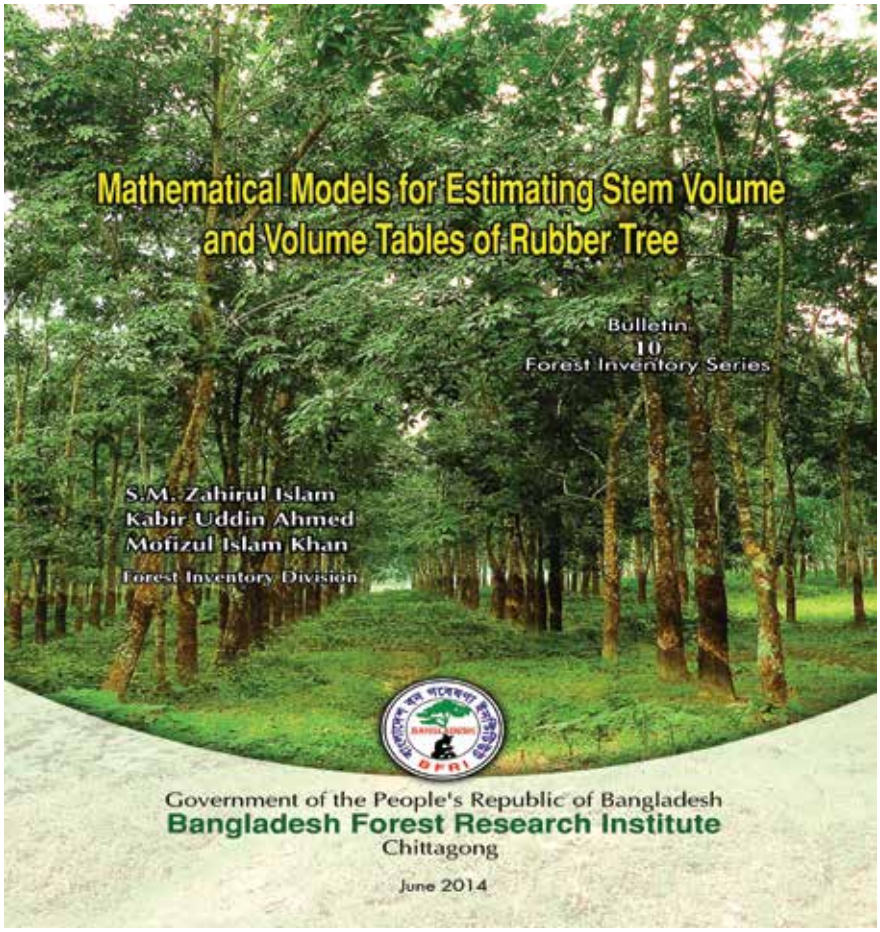

B. One Way Volume Measurement:

শুধু বুক সমান উচ্চতায় গাছের বেড় জানা থাকলেও গাছটিতে কি পরিমাণ কাঠ আছে তা বের করা যায়।

উদাহরণ: কোন সৃজিত বাগানে 1000 টি রাবার গাছের গড় বেড় 90 সে.মি.। নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে কাঠের পুরো আয়তন নির্ণয় করা যায়-

$\ln(Vob) = -10.5628+2.1502\times\ln(G)$

$= -10.5628+2.1502\times\ln(90) = -0.887$

আয়তন (V) = $1000\times Exp(-0.887) = 1000\times0.4118$ ঘন মিটার = 411.8 ঘন মিটার

= 411.8 35.32 ঘন ফুট = 14543.44 ঘন ফুট।

সুন্দরবনের ৬ টি গুরুত্বপূর্ন ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ব্যাসের বর্ধনহার নির্ণয়

সুন্দরবন প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৪,১১০ বর্গ কি.মি. জুড়ে অবস্থিত। এটি জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত লবণাক্ত জলাভূমি বন। নানা ধরনের গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রানীর অনন্য সমাবেশ এ বনভূমিকে চিহ্নিত করেছে এক অপরূপ নির্দশন হিসাবে। সুন্দরবনের গাছপালার অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ ধরণের এবং এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা এবং আরোহী উদ্ভিদসহ নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি হল: সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, কেওড়া, বাইন ও কাঁকরা। বন ইনভেন্টরী বিভাগ সুন্দরবনের উক্ত প্রজাতি সমূহের বৃদ্ধির হার নির্ণয়ে একটি গবেষণা কর্মসূচী গ্রহন করে এদের বুক উচ্চতায় ব্যাসের বর্ধনহার নির্ণয় করে, যাহা নিম্নের স্রণীতে উপস্থাপন করা হল:

প্রজাতি	বাৎসরিক ব্যাস বর্ধন হার (সে,মি,)
সুন্দরী	০.০৬ - ০.১৫১
গেওয়া	০.০৪৯ - ০.১৮৯
পশুর	০.২০৬
কেওড়া	০.১৯২
বাইন	০.২১৯
কাঁকরা	০.১৭৮

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম লবণাক্ততা এবং উর্বর অঞ্চলে গাছের বুক উচ্চতায় বর্ধনহার বেশী হয়। অর্থাৎ গাছের বুক উচ্চতায় বর্ধনহার লবণাক্ততা এবং সাইট কোয়ালিটির উপর নির্ভরশীল, তবে প্রজাতি মিশ্রণের উপর ইহা নির্ভর করে না। সুন্দরী গাছের আগা মরার কারণে সুন্দরী গাছের বর্ধনহার কমেছে যাহা নিম্নের সরণিতে উপস্থাপন করা হল:

সুন্দরী গাছের ধরণ	বুক উচ্চতায় ব্যাস বৃদ্ধির হার (%)	বেসাল এরিয়া বৃদ্ধির হার (%)	আয়তন বৃদ্ধির হার (%)
সুস্থ গাছ	১৫.৬২	২৭.৫	৩৩.৮৭
আগা-মরা গাছ	৬.৭	১৩.০	১৮.৬৫

গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, এই বন এলাকায় উক্ত সময়ে সুন্দরী গাছের সংখ্যা কমেছে এবং গেওয়া গাছের সংখ্যা বেড়েছে।

বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ

মানব জাতির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাঠ আমাদের জীবনের নিত্য দিনের সঙ্গী। কাঠের ব্যবহার মানব সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। জ্বালানি থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র, নৌকা, রেলের স্লীপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম, কাগজ প্রভৃতি কাঠ থেকেই তৈরি হয়। মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই বিভিন্ন উপকরন হিসাবে কাঠ ব্যবহার করে আসছে। তাই কাঠ আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

কাঠ (Wood) এবং টিম্বার (Timber) কি ?

উড বা কাঠ বলতে আমরা বৃক্ষের শক্ত কান্ডকে বুঝে থাকি। আসলে নগ্নবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের শক্ত কান্ড থেকে এ কাঠ পেয়ে থাকি। বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহৃত কাঠ গুলি টিম্বার হিসাবে পরিচিত। কাজেই সকল টিম্বার কে আমরা উড বলতে পারি কিন্তু সকল উড কে টিম্বার বলা যায় না। আমাদের দেশে প্রায় ৬০০ প্রকার উদ্ভিদ হতে কাঠ উৎপাদন করা হয়। এর মধ্য ১০০ টি উদ্ভিদ টিম্বার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়।

কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়

- উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবি হতে হবে।
- উদ্ভিদের লম্বা ও মোটা কান্ড থাকতে হবে।
- উদ্ভিদের প্রত্যেক বছর গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) হতে হবে।
- বাঁশ আকৃতিগত ভাবে দেখতে কাঠের মত কিন্তু কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষের ন্যায় গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) হয় না বলে বাঁশকে কাঠ বলা যায় না।

কাঠ শনাক্ত কেন করবেন ?

কাঠ শনাক্তকরণ পদ্ধতি উন্নত বিশ্বে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। কাঠ শনাক্তকরণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহারের জন্য কাঠ শনাক্তকরন প্রয়োজন। সাধারন মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরির সময় কাঠ মিস্ত্রী বা কাঠ ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় কাঠ শনাক্ত করে থাকে। এসব লোক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং কাঠের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাঠ শনাক্ত করে থাকে। কিন্তু তাদের এই শনাক্তকরণ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রহনযোগ্য নহে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তারা এই কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম বিধায় বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে প্রচুর কাঠ আমদানি করা হচ্ছে। ফলে সঠিক কাঠ চিহ্নিত করণের জন্য দিন দিন কাঠ শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাঠ শনাক্তকরণের উপকারিতা

- সঠিক কাঠ ব্যবহার করে দ্রব্যাদি/ আসবাবপত্র তৈরি করলে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই হয়।
- পোকা ও ঘুণের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
- অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।
- দূর্ঘটনা/স্ট্রাকচারাল ব্যর্থতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- সঠিক প্রজাতি শনাক্তকরণে বনজ সম্পদ রক্ষা পায়।
- কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কাঠ শনাক্তকরণের প্রচলিত পদ্ধতি

আমাদের দেশে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাঠ ব্যবহার করে বা কাঠের কাজ করে তারা নির্দিষ্ট কিছু কাঠ সহজে চিনতে পারে। এসব কাঠ শনাক্তকরণের জন্য তারা যে সমস্ত প্রচলিত পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে থাকে সেগুলি হলো কাঠের রং, ওজন, গ্রেন বা আঁশ বিন্যাস এবং কাঠের গন্ধ এসব বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে ১০-১৫ টি প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে ৬০০ উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠের মধ্যে ১০০ টির মতো কাঠ টিম্বার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সব গুলি কাঠ সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভবপর নয়। কারণ এসব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়। কাজেই সঠিক ভাবে কাঠ শনাক্তকরণের জন্য একমাত্র লাগসই পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ।

কাঠ শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

কাঠ সাধারনত চার প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। এসব কোষের গঠন কৌশল, বিন্যাস এবং প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যদি ও এদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা সম্ভব কিন্তু এদের অভ্যন্তরীণ গঠন কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কাজেই কাঠের এসব অভ্যন্তরীণ গঠনের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে কাঠ শনাক্তকরণ করা একটি বিজ্ঞান সম্মত এবং টেকসই পদ্ধতি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত ''হ্যান্ড লেন্স কি'' তে কাঠের বাহ্যিক গঠন এবং অভ্যন্তরীণ গঠন (কৌশল) বিশ্লেষণ করে কাঠ শনাক্তকরণের একটি সহজ কৌশল তৈরি করা হয়েছে। এটা অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত এবং এর মাধ্যমে অতি সহজে কাঠ শনাক্তকরণ করা সম্ভব।

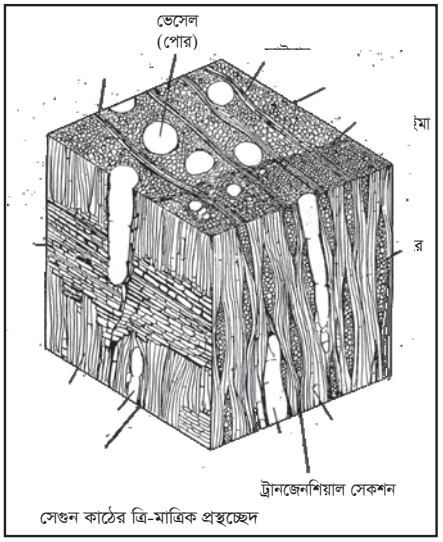

সেগুন কাঠের ত্রি-মাত্রিক প্রস্থচ্ছেদ

হারবেরিয়াম বা উদ্ভিদ সংগ্রহশালা

হারবেরিয়াম হল উদ্ভিদ সংগ্রহশালা। যা শুষ্ক বা স্পিরিটে সংগৃহীত বিশদ তথ্য সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত উদ্ভিদ সংরক্ষনাগার। এটাকে উদ্ভিদ নমুনার যাদুঘরও বলা যেতে পারে। এখানে উদ্ভিদ নমুনা শুকিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। তাছাড়া, এখানে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থাকে। সাধারণত Pruning secateur দিয়ে কেটে ভালো ফুল বা ফল সম্বলিত ২০-৩০ সে.মি.লম্বা উদ্ভিদ বা ডাল সংগ্রহ করা হয়। ছোট বীরুৎ অথবা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শিকড় ও স্পোরসহ পাতা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাটি সতেজ রাখার জন্য বায়ু নিরোধী পলিথিন ব্যাগে রাখা বাঞ্চনীয়। উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ শেষে শুকানোর জন্য ৪৫ সে.মি.ও ৩০ সে.মি. বিশিষ্ট প্ল্যান্ট প্রেস বা উদ্ভিদ চাপযন্ত্র প্রয়োজন হবে। সংগৃহীত নমুনা পুরাতন খবরের কাগজের ভাঁজে স্থাপন করে খবরের কাগজের উপরে নীচে চুষ কাগজ (ব্লটিং পেপার) দিয়ে প্ল্যান্ট প্রেসে বেঁধে রোদে অথবা প্লান্ট ড্রায়ারে শুকাতে হবে। চাপে শুষ্ককৃত নমুনায় কীট ও ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগের পর (২৬.৬ সে.মি. x ৪১.৯ সে.মি.) হারবেরিয়াম শীটে (মোটা সাদা ৩০০ গ্রাম সুইডিশ বোর্ড পেপার) নমুনাটি সুই সুতা দিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিতে হয়। এরপর নমুনা সম্বলিত যাবতীয় তথ্যাদি লেবেলে (৭ x ১২ সে.মি.) লিপিবদ্ধ করে হারবেরিয়াম শীটের নিচের দিকের ডান কোণে এঁটে দিতে হবে।

হারবেরিয়ামে সংরক্ষিতউদ্ভিদ নমুনা

তারপর বাঁধাইকৃত নমুনা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে Filing করে সংরক্ষণ করা হয়। প্রথমত; হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক ও বাঁধাইকৃত নমুনাকে কীটপতঙ্গ এবং ছত্রাকের আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য প্রতি ৬ মাস অন্তর ন্যাপথেলিন বা কর্পূর দিয়ে Poisoning করতে হয়। দ্বিতীয়ত; ডীপ ফ্রিজে ঠান্ডা ট্রিটমেন্ট দিয়ে পতঙ্গের লার্ভা ও ডিম মেরে ফেলে কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। এক্ষেত্রে নমুনাগুলো প্যাকেটে করে – ১১৮^{o}সে: তাপমাত্রায় একটানা ৪৮ ঘন্টার জন্য ডীপ ফ্রিজে রাখতে হয়। সংরক্ষণের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে সংগৃহীত উদ্ভিদের মূল, কান্ড, ফুল ও সরস ফল সমূহকে কাঁচের জারে সংরক্ষণ করতে স্ট্যান্ডার্ড প্রিজার্ভেটিভ ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে FAA (ফরমালিন অ্যাসিটো অ্যালকোহল) দ্রবণ তৈরি করতে ৫০% রেকটিফাইড স্পিরিট (ইথানল অ্যালকোহল), ৫% এসিটিক এসিড, ১০% ফরমালিন এবং পরিস্রুত পানি ৩৫% প্রয়োজন হয়।

হারবেরিয়ামে শীটে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা

এফএএ দ্রবণে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা

BFRI হারবেরিয়াম ১৯৫৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে শ্রেণী করণ বিদ্যার গবেষণা, উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চা, দেশের ভেষজসম্পদ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) সংরক্ষণে এই হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এটি দেশের ২য় বৃহত্তম হারবেরিয়াম। এই হারবেরিয়ামে ১৮০ পরিবারের ৭৫০ গণের অধীনে ১,৬০০ প্রজাতির প্রায় ৩০,৭০০ উদ্ভিদ নমুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া নৃ-তাত্ত্বিক জন-গোষ্ঠির ব্যবহৃত ৪৫০ প্রজাতির ১,৫০০ উদ্ভিদ নমুনাও সংরক্ষিত আছে।

উক্ত হারবেরিয়ামের উপাত্ত হতে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের উদ্ভিদ নমুনার বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় যা পুনরায় বন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এছাড়াও বিলুপ্ত প্রাপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতি নিরুপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি, গবেষক ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই হারবেরিয়ামে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাহায্যে এম.ফিল, পি.এইচ.ডি সহ বিভিন্ন গবেষণা কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া হারবেরিয়ামের উদ্ভিদ শ্রেণী বিন্যাস তত্ত্ববিদ কর্তৃক ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিনামূল্যে উদ্ভিদ নমুনা শনাক্ত করে থাকে। বিশেষকরে, ফার্মেসী বিভাগের ছাত্ররা ভেষজ গাছপালা সঠিক ভাবে শনাক্ত করণ করে তাদের একাডেমিক কোর্স সম্পন্ন করছে।

জাইলেরিয়াম বা কাষ্ঠ সংগ্রহ শালা

মানব জাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্বালানি থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র, নৌকা, রেলের স্লীপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম, কাগজ প্রভৃতি কাঠ থেকেই তৈরি হয়। তাই কাঠ আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কাজেই কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহারের জন্য সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্ত করন প্রয়োজন। গ্রীকশব্দ জাইলোজ থেকে জাইলেরিয়াম শব্দের উদ্ভব যার অর্থ হলো কাঠ। তাই জাইলেরিয়াম অর্থ হলো কাষ্ঠ সংগ্রহ শালা। এখানে কাষ্ঠ নমুনা গুলোকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরে স্তরে তথ্য সন্নিবেশ করে সাজিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জাইলেরিয়ামটি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জাইলেরিয়ামটি দেশের একমাত্র কাঠের নমুনা পরীক্ষাগার ও কাঠের সংগ্রহশালা এবং কাঠের এনাটমিক্যাল গবেষণার জন্য একমাত্র কেন্দ্র। কাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদ। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাঠকে সাধারণত টিম্বার বলা হয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভাবে প্রায় ৭০-৮০ টি প্রজাতির কাঠ টিম্বার হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হয়। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠের রং এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য একই রকম দেখালেও এদের অভ্যন্তরীণ গঠনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের পূর্বে সঠিক ভাবে কাঠশনাক্ত করে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী।

চেরাইকৃত কাঠ

জাইলেরিয়ামে সংরক্ষিতকাষ্ঠ নমুনা

বিভিন্ন রং এর কাঠ

বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন শৈলীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের উপযুক্ততা নির্ণয় করা হয়। কাঠের উপযুক্ত তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমনঃ নির্মাণ সামগ্রী, রেলের স্লিপার, প্লাইউড ও ভিনিয়ার, আসবাবপত্র, বাস, ট্রাকেরবডি, ক্রীড়াসামগ্রী, প্যাকিং কেস এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে কাঠ শনাক্ত করণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের সঠিক প্রজাতি নির্বাচন করতে সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরির সময় কাঠ মিস্ত্রী বা কাঠ ব্যবসায়ীর সহয়োগিতায় কাঠ শনাক্ত করে থাকে। কিন্তু এই শনাক্তকরণ পদ্ধতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আমাদের দেশে কিছু কাঠ ব্যবসায়ী একই রংয়ের উন্নত মানের কাঠের সাথে নিম্নমানের কাঠ মিশিয়ে বিক্রি করে থাকেন। ফলে ভোক্তাগোষ্ঠী আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অপরদিকে বার বার কাঠ ব্যবহারের ফলে বনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কাজেই সঠিক কাজে সঠিক প্রজাতির কাঠ ব্যবহারের জন্য একমাত্র লাগসই পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ।

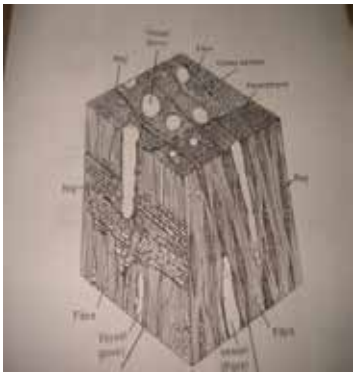

কাঠের অভ্যন্তরিণ গঠন

সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কাঠ বিভিন্ন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের গঠন, কৌশল, বিন্যাস এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাঠের অভ্যন্তরিণ গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। কাঠের রং পরিবর্তনশীল হলেও এদের অভ্যন্তরিণ গঠন কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের, বনউদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের জাইলেরিয়ামটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ চিহ্নিত করে থাকে। বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণে সহায়তা ও সরকারকে রাজস্ব দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এখানে চিহ্নত প্রজাতির প্রতিটি কাঠের টুকরা পরীক্ষার জন্য ৫০০/- টাকা এবং অচিহ্নিত প্রতিটি প্রজাতির কাঠের টুকরার জন্য ২০০০/- করে রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে কাঠ শনাক্তকরণ করা হয়ে থাকে। জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ বনের ৬৫০ টি কাঠের নমুনা এবং বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর ২০ টি দেশ থেকে আনীত প্রায় ২০০০ টি কাঠের নমুনা এখানে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া দেশীয় কাঠের প্রায় ২২০০ টি পারমানেন্ট স্লাইড এই জাইলেরিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

এ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের অন্যান্য ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে উদ্ভিদ ও বনবিদ্যার ছাত্র/ছাত্রী ও গবেষকগণ এই গবেষণাগারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কাঠ শনাক্ত করণ পদ্ধতিসহ কাষ্ঠ বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে জাইলেরিয়ামটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্ত করণের ফলে দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এবং পরিবেশগত উন্নয়নে জাইলেরিয়ামটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বৃক্ষরাজি

বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং এর মোট ভূমির পরিমাণ ১৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর যার মধ্যে ২.৪ মিলিয়ন হেক্টর কৃষ্ণ আচ্ছাদিত। মোট ভূমির প্রায় ১৬.৭% এলাকায় বনভূমি রয়েছে। বনভূমিগুলো পূর্ব এবং দক্ষিন-পূর্বাঞ্চীয় পাহাড়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং দক্ষিন পশ্চিম ম্যানগ্রোভ এলাকা দ্বারা বিস্তৃত। বৃক্ষ বনের ইকোসিস্টেমের একটি প্রধান উপাদান। বৃক্ষের প্রত্যেক্ষ এবং পরোক্ষ অনেক মূল্য রয়েছে। উদ্ভিদ সম্পদ ব্যবহার ও ব্যস্থাপনার জন্য উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উদ্ভিদরাজির পূর্নাঙ্গতালিকা প্রস্তুত করা এখনও সম্ভব হয়নি। উদ্ভিদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বনজ বৃক্ষের তালিকা বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন গবেষকের প্রবন্ধে বাংলাদেশের উদ্ভিদরাজি সম্পর্কে আংশিক ধারণা পাওয়া যায়। প্রায় ৬,০০০ এর অধিক উদ্ভিদ প্রজাতির রয়েছে। এ উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো শনাক্তকরণ করা অনেক কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে "Trees of Bangladesh" নামক বইটিতে বাংলাদেশে জন্মানো বৃক্ষের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বইটি ২০০১ সালে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট,চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বনে, গ্রামে বসতবাড়িতে জন্মানো দেশীয়, বিদেশি এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত ৬৭টি পরিবারের অধীনে ৩৪২ টি বৃক্ষের একটি সিস্টেমেটিক বর্ণনাসহ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। অনেক ফলের এবং শোভাবর্ধনকারী গাছও এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

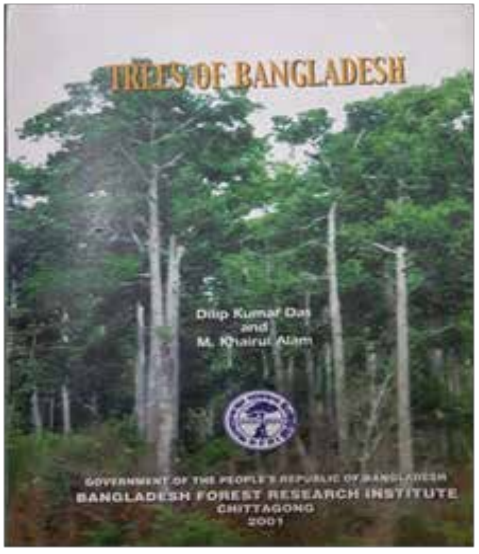

এখানে প্রতিটি বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, ইংরেজী নাম,পরিবার, বিস্তার এবং ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সংক্ষিপ্তাকারে গাছের আকার, উচ্চতা, বাকল, পাতা, ফুল এবং ফলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাতার আকার, গঠন, পৃষ্ঠতল এবং শিরা, উপশিরা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পুষ্পমঞ্জরী, পুষ্পবিন্যাস, পুংকেশর, স্ত্রীকেশর, গর্ভাশয়, ফলের আকার প্রকার ইত্যাদি বিষয়গুলো বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃক্ষগুলোর ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে এবং বৃক্ষের বর্ণনায় সংক্ষিপ্তাকারে কাঠের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বইটির শেষে বৈজ্ঞানিক নাম ও স্থানীয় নামের তালিকা এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষার শব্দগুলোর শব্দকোষ প্রদান করা হয়েছে। এই বইয়ের তথ্যগুলো ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সাধারণ জনগণ অতিসহজে উদ্ভিদ শনাক্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী বৃক্ষসমূহ

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং এখানে জমির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্ষের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক পরিমাণে বৃক্ষ কর্তনের ফলে মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যদিও সরকার দ্রুতবর্ধনশীল গাছ রোপণ, সামাজিক বনায়ন, কৃষি বনায়ন এবং ন্যাড়া পাহাড়গুলো বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষের ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করছে। সমতলভূমি এবং শুধু পাহাড়ি অঞ্চলে এই কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে। কিন্তু দেশের নিম্নাঞ্চলে এধরনের কোন কার্যক্রম বিদ্যমান নাই। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭.৯ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাজুড়ে নিম্নভূমি রয়েছে। প্লাবনের গভীরতা ও প্লাবনের সময়ের উপর নির্ভর করে অনেক বৃক্ষ নিম্নাঞ্চলে জন্মে থাকে। সেজন্য প্লাবন ভূমির নিম্নাঞ্চল এলাকায় বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী সঠিক প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের প্রায় আট মিলিয়ন হেক্টর ভূমির অর্ধেকের ও বেশি অংশ বর্ষাকালে পানির নীচে থাকে। সাধারণত এই জাতীয় ভূমিতে কোন প্রাকৃতিক বনভূমি নেই। নিম্নাঞ্চলগুলোর একটি অংশ বিশেষ করে নদীরপাড়, খাল, বিল ও হাওড় ইত্যাদি জায়গাগুলো গাছ রোপণের জন্য উপযুক্ত।সঠিক বৃক্ষ প্রজাতি এবং নিদির্ষ্ট এলাকা নির্বাচনের উপর বনায়নের সাফল্য নির্ভর করে থাকে। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে কোন ধরনের বৃক্ষপ্রজাতির রোপণের জন্য উপযোগী সে ধরনের কোন তালিকা নেই। ‘‘Trees for Low-lying Areas of Bangladesh’’ নামক বইটিতে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী ৩৫ টি পরিবারের অধীনে ১৮১ টি বৃক্ষের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং এদের সংক্ষিপ্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্নণা প্রদান করা হয়েছে। এই বইটি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে প্রতিটি প্রজাতির ছবি, স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, কোন মাটিতে জন্মে, কোন জেলায় বেশী জন্মে, বংশবিস্তার এবং কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যে কেউ চাইলে উক্ত বইয়ের সাহায্যে দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোতে লাগানো উপযোগী সঠিক প্রজাতির গাছ চিহ্নিত করতে পারবে এবং দেশের বৃক্ষের চাহিদা স্বল্প পরিসরে হলেও পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্ল্যান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রতিষ্ঠিত কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে ৭১০ কি.মি. দীর্ঘ যা পূর্বে নাফ নদী এবং পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিস্তীর্ণ এলাকায় অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ আছে। ক্রমাগত পলি পড়ার কারণে প্রতি বছরেই নতুন নতুন চর সৃষ্টি হচ্ছে। সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছাসে প্রতি বছরই কম-বেশি দেশের উপকূলীয় এলাকা দূর্যোগ কবলিত হয়। উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৬৬ সন হতে উপকূলীয় চর বনায়নের কাজ শুরু করে। এ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ১,৯০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করা হয়েছে। উক্ত বাগানের ৯৪ ভাগই হচ্ছে কেওড়া প্রজাতির একক বাগান। কিন্তু কেওড়ার একক প্রজাতির বন সৃজনের ফলে এ বন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে কেওড়ার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ও গাছ মরে যাওয়া উল্লেখযোগ্য। বনভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি, মাটি শক্ত হওয়া, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির অনুপস্থিতি এবং রিজেনারেশন না আসার ফলে বনের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা নিয়ে আশংকা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, টেকসই লাগাতার বন সৃজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্ল্যান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ কর্তৃক কেওড়া বাগানের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির আন্ডারপ্ল্যান্টিং বাগান সৃজনের পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে ৭টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি ২য় পর্যায়ের বন সৃজনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

প্রজাতি নির্বাচন

উপকূলীয় এলাকার কেওড়া বনের অভ্যন্তরে স্থানোপযোগী অন্যান্য ১১টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগান উত্তোলন পদ্ধতির উপর দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। প্রজাতিগুলো হলো: সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দুল, কাঁকড়া, খলসী, সিংরা, গরান, কিরপা, হেঁতাল এবং গোলপাতা। তন্মধ্যে ৭টি প্রজাতি যথা- সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, খলসী, সিংড়া, হেঁতাল এবং গোলপাতা উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়।

চারা উত্তোলন পদ্ধতি

- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হতে মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সুস্থ ও সবল গাছ থেকে পরিপক্ক বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারি উত্তোলনের জন্য শুধুমাত্র ভরা মৌসুমে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় এমন সমতল ভূমি নির্বাচন করতে হবে। নদী বা সমুদ্রের পাড়ে এমন স্থানে নার্সারি উত্তোলন করা যাবে না যেখানে সরাসরি ঢেউয়ের আঘাতে নার্সারির চারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশস্কা থাকে।
- গোলপাতা ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির চারা পলিব্যাগে উত্তোলন করা উত্তম। এতে চারা রোপণের পর জীবিতের হার বেশী পাওয়া যায়। চারা উত্তোলনের জন্য ২৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা উত্তম। তবে খরচ কমানোর জন্য ১৫ সে.মি. x ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগও ব্যবহার করা যেতে পারে।

- পাঁচ ভাগ ঘুড়ো দোআঁশ মাটি এবং এক ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ পলিব্যাগে ভর্তি করে ১২ মি. x ১.২ মি. বেডে সাজিয়ে পলিব্যাগে বীজ বপন করতে হবে।
- প্রখর রোদ ও বৃষ্টি থেকে কচি চারাগুলোকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপরে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে চালা দিতে হবে। বীজতলায় নিয়মিত পানি দিতে হবে এবং আগাছা পরিস্কার করতে হবে প্রয়োজনে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
- গবাদিপশুর অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য বীজতলার চারিদিকে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে।
- নিয়মিত পরিচর্যার পর ১০-১২ মাস বয়সের চারা বাগানে রোপণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র ৩ মাস বয়সের গোলপাতার চারা মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়। রোপণের জন্য ভাল ও স্বাস্থ্যবান চারাগুলি সতর্কতার সাথে গ্রেডিং করে বাছাই করে নিতে হবে।

স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

- স্থানোপযোগী ম্যানগ্রোভ প্রজাতির আন্ডার প্ল্যান্টিং বাগান উত্তোলনের জন্য ৯-১২ বছর বয়সের কেওড়া বাগান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত বাগান অবশ্যই কমপক্ষে ৩ মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে হবে।
- চারা রোপণের জন্য নির্বাচিত কেওড়া বাগানের অভ্যন্তরের আগাছা কেওড়া গাছের নীচের দিকের ছোট ছোট ডালপালা কেটে পরিস্কার করতে হবে। নির্বাচিত এলাকার কাটা জঙ্গল পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

- বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে চারা রোপণের কাজ শুরু করা যায়, তবে পানির ঢেউয়ের আঘাতের সম্ভাবনা বেশী থাকলে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে চারা রোপণ করা উত্তম।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তুত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় চারা রোপণের স্পটগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য নির্দিষ্ট দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে। এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডালা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কেওড়া বাগানের অভ্যন্তরে প্রজাতিভেদে ১.২ মি. x ১.২ মি. বা ১.৫ মি. x ১.২ মি. দুরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।
- চারা রোপণের জন্য স্পট চিহ্নিত প্রতিটি খুটির গোড়ায় গর্ত তৈরি করতে হবে। ১৫ সে.মি. x ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগের চারার জন্য ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. আয়তনের গর্ত তৈরি করতে হবে।
- নির্বাচিত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সমূহের ১০-১২ মাস বয়সের সুস্থ ও সবল চারা মাঠে রোপণ করতে হবে নার্সারি থেকে চারাগুলো নৌকায় বা ঝুড়িতে করে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত স্থানে নিয়ে যেতে হবে।
- নির্বাচিত জমি কর্দমাক্ত থাকে বিধায় গর্ত তৈরি করার সাথে সাথে চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত হয়। চারা লাগানোর সময় পলিথিন ব্যাগটি কেটে ফেলে দিয়ে মাটির বলসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে।
- রোপিত চারাগুলোকে সোজা করে সহায়ক কাঠির সাথে বেঁধে দিতে হবে।

ভোলার চর কুকরীতে ১৪ বছর বয়সের গেওয়া আন্ডার প্ল্যান্টিং বাগান

পটুয়াখালীর চর কাশেমে ১৫ বছর বয়সের সুন্দরী আন্ডার প্ল্যান্টিং বাগান

বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকার বিরূপ পরিবেশে বনায়ন সফল করতে সতর্কতার সাথে ৪/৫ বছর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য।
- বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক। আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছর ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা ও ডালপালা পরিস্কার করতে হবে।
- গৃহপালিত গবাদিপশু বা বন্যপ্রাণীরা বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন মোতাবেক বাগান এলাকার চারিপাশে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে। চারার উচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর লাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে।

পটুয়াখালীর চর কাশেম ১৫ বছর বয়সের পশুর আন্ডার প্ল্যান্টিং বাগান

ভোলার চর কুকরীতে ১৮ বছর বয়সের সিংরা আন্ডার প্ল্যান্টিং বাগান

- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়। তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে বর্ষা মৌসুমে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে গাছে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

উপকূলীয় এলাকার উঁচু ভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন পদ্ধতি

ভূমিকা

বাংলাদেশের ১৯টি জেলার ৪৮টি উপজেলা উপকূলীয় এলাকার অন্তর্ভূক্ত। এ বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য দ্বীপ আছে। সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছাসে প্রতিবছরই কম-বেশী দেশের উপকূলীয় এলাকা দুর্যোগ কবলিত হয়ে পড়ে। উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং নূতন জেগে উঠা চরাঞ্চলকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য ১৯৬৬ সাল হতে বন বিভাগ উপকূলীয় এলাকার চরাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর বন সৃজন করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে পলি পড়ায় এবং পশু চারণের ফলে এ এলাকার অনেক বনাঞ্চলের জমি স্থায়ী, শক্ত ও অনেক উঁচু হয়ে গেছে। এ সকল জমি সাধারণতঃ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় না। ফলে এখানকার কেওড়া প্রজাতির বর্ধনহার কমে যায় এবং ক্রমান্বয়ে কেওড়া গাছ মারা যায়। কাজেই উক্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য আর উপযুক্ত থাকে না। এ সমস্ত ভূমিতে সমতল ভূমির বৃক্ষ প্রজাতির (নন-ম্যানগ্রোভ) বাগান সৃজন করা যায় কিনা তা যাচাই এর জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্ল্যানন্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচু জমিতে বেশ কিছু মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া যায় যা উপকূলীয় টেকসই বন সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রজাতি নির্বাচন

উপকূলীয় এলাকার উঁচু ভূমিতে সমতল ভূমির ১৩টি বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন পদ্ধতির উপর দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা পরিচালন করা হয়। প্রজাতিগুলি হলো- রেইন ট্রি, ঝাউ, সাদা কড়ই, কালো কড়ই, জাম, খইয়া বাবলা, বাবলা, মেহগনি, ছনবলই, নিম, শিশু, জারুল এবং ইপিল-ইপিল। তন্মধ্যে ৬টি প্রজাতির বৃক্ষ যথা রেইন ট্রি, ঝাউ, সাদা কড়ই, কালো কড়ই, খৈয়া-বাবলা এবং বাবলা উপযুক্ত হিসাবে সনাক্ত করা হয়।

চারা উত্তোলন পদ্ধতি

- জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সুস্থ ও সবল গাছ থেকে পরিপক্ক বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- নার্সারি স্থাপনের জন্য উঁচু সমতল ও বর্ষাকালে বন্যামুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। চারা উত্তোলনের জন্য সমতল ভূমিতে ইট, বাঁশের তরজা বা সুপারি গাছের ফালি দিয়ে এজিং তৈরি করে ১২ মি x ১.২ মি. আকারের সীড বেড প্রস্তুত করতে হবে।
- নার্সারিতে ২৫ সি.মি. x ১৫ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ চারা উত্তোলন করা উত্তম, তবে ১৫ সে.মি. x ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- তিন ভাগ গুড়ো দোআঁশ মাটি এবং এক ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ পলিব্যাগে ভর্তি করে সীড বেডে সাজিয়ে ব্যাগে বীজ বপন করতে হবে।
- রোদ ও বৃষ্টি থেকে গজানো চারাগুলিকে রক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে বীজতলার উপরে অস্থায়ী চালা দিতে হবে।

- বীজতলায় নিয়মিত পানি দিতে হবে এবং আগাছা পরিস্কার করতে হবে। প্রয়োজনে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
- গবাদিপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজতলার চারিদিকে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে।
- নিয়মিত পরিচর্যার পরে ৪-৬ মাস বয়সের চারা বাগানে রোপণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। রোপণের পূর্বে ভাল ও স্বাস্থ্যবান চারাগুলি সতর্কতার সাথে গ্রেডিং করে নিতে হবে। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত চারা বাছাই করে বাদ দিতে হবে।

স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

- উপকূলীয় এলাকার অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি যেখানে লবাণাক্ততা কম এবং জোয়ারের পানিতে শুধুমাত্র বর্ষাকালের ভরা মৌসুম ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্লাবিত হয় না তথায় বাগান সৃজনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অধিক লবণাক্ত এলাকার স্থান নির্বাচন করা যাবে না।
- উপকূলীয় এলাকার বেড়ি বাঁধের ঢালুতে রাস্তার ধারে উচু পতিত জমিতে এবং বসতবাড়ির আশেপাশের উঁচু জমিতে উক্ত প্রজাতিসমূহের চারা রোপণ করা যায়।
- চারা রোপণের জন্য নির্বাচিত এলাকার জঙ্গল ও লতাপাতা কেটে পরিস্কার করে ফেলতে হবে। কাটা জঙ্গল জমিতে রেখে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

- বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তুত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় চারা রোপণের স্পটগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য নির্দিষ্ট দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে। এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডালা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- চারা রোপণের অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে প্রতিটি খুঁটির গোড়ায় গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার পলিব্যাগের আকার অনুযায়ী তৈরি করতে হবে। ১৫ সে.মি. x ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগের চারার জন্য ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. আয়তনের গর্ত তৈরি করতে হবে।
- চারার মধ্যবর্তী ও সারির দুরত্ব কত হবে তা নির্ভর করবে ভবিষ্যতে গাছগুলির ব্যবহার ও থিনিং প্লানের উপর। তবে সাধারণতঃ ২ মি. x ২ মি. দুরত্বে উক্ত প্রজাতি সমূহের চারা রোপণ করা উত্তম।
- উক্ত প্রজাতিগুলির ৪-৬ মাস বয়সের সুস্থ ও সবল চারা মাঠে রোপণ করতে হবে। নার্সারি থেকে চারাগুলো দেশি নৌকায় বা ঝুড়িতে করে সতর্কতার সাথে বাগান করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে।
- চারা লাগানোর সময় পলিথিন ব্যাগটি কেটে ফেলে দিয়ে মাটির বলসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চার পাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে চারা লাগানোর সময় যেন মাটির বল ভেঙ্গে না যায় এবং চারার শিকড় গর্তের ভিতরে পেঁচিয়ে না যায়।
- চারা রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে না পড়ে।

বাগান পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

- চারা রোপণের পর এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপিরিহার্য। উপকূলীয় এলাকার বিরূপ পরিবেশে এ ধরণের বনায়ন সফল করতে অন্তত ৪ বছর পর্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচর্যা করে বাগানের চারাগুলো বড় করে তুলতে হবে।

- সৃজিত বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক। আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছর ৩ বার এবং পরবর্তী ৪ বছর পর্যন্ত ২ বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- গৃহপালিত গবাদিপশু বা বন্যপ্রাণীরা বাগানের চারাগাছ ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেজন্য বাগান এলাকার চারিপাশে শক্ত করে বেড়া দিয়ে নিয়মিত তদারকি করা আবশ্যক। চারার উচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে।
- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়। তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে বর্ষা মৌসুমে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
- গাছ একটু বড় হয়ে ক্যানোপি কাছাকাছি মিশে আসলে নিচের দিকে ঝুলে থাকা ডালপালা ধারাল দা দিয়ে কান্ডের খুব কাছাকাছি কেটে দিতে হবে। এভাবে অতিরিক্ত ডালপালা কেটে দিলে গাছের কান্ড সোজা ও বড় হয়, এতে ভবিষ্যতে মূল কান্ডটি মূল্যবান কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- চারা গাছের শিকড় মাটির উপর বের হয়ে গেলে অতিরিক্ত মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে।
- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে গাছে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- বাগানের গাছের বয়স ৫-৬ বছর হলে থিনিং পদ্ধতি অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও রোগাক্রান্ত গাছগুলি অপসারণ করে পাতলা করে দিতে হবে।

পটুয়াখালীর চর কাসেমে ১৫ বছর বয়সের ঝাউ বাগান

পটুয়াখালীর চর কাসেমে ১৫ বছর বয়সের সাদা কড়ই বাগান

ভোলার চর কুকরিতে ১৫ বছর বয়সের খইয়া বাবলা বাগান

পটুয়াখালীর চর কাসেমে ১৫ বছর বয়সের রেইন-ট্রি বাগান

বাংলাদেশের উপকূলীয় বসতবাড়িতে কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন কৌশল

ভূমিকা

বাংলাদেশের বসতবাড়িগুলি একটি বাড়ি একটি খামার হিসাবে পরিচিত। বসতভিটায় বনায়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বসতভিটাগুলো কাঠ, জ্বালানী, ফল, বাঁশ, বেত, শাকসব্জি, পশুখাদ্য, গৃহনির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের সকল বসতভিটায় কম-বেশী কৃষি-বনের প্রাকটিস হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৭১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলীয় এলাকার আয়তন প্রায় ৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের ৩২ ভাগ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার ৪৮ টি উপজেলা উপকূলীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ইদানিং হঠাৎ হঠাৎ অস্বাভাবিক জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়েও ফসলের ব্যপক ক্ষতি করে থাকে। এ এলাকায় ৬.৮৫ মিলিয়ন বসতবাড়ি রয়েছে এবং মোট জনসংখ্যার ২৮ ভাগ মানুষ এ এলাকায় বসবাস করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ছোট বড় চর বা দ্বীপ নিয়ে গঠিত । এই চর বা দ্বীপগুলো অসংখ্য ছোট বড় নদী দ্বারা বেষ্টিত এবং ছোট বড় খাল দ্বারা বিভাজিত। এখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র। তারা কৃষি কাজ, শ্রম বিক্রি এবং মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে আবাসনের চাহিদা মেটাতে এ এলাকার মানুষেরা প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর উঁচুভূমিতেও নতুন নতুন বসতি স্থাপন করছে। এই উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর অধিকাংশতেই বেড়ি বাঁধ নেই। ফলে সহজেই অস্বাভাবিক জোয়ারের পানি দ্বারা এদের বসতবাড়ি প্লাবিত হয়ে থাকে। আবার যে সমস্ত এলাকায় বেড়ি বাঁধ আছে তা ছোট ছোট খাল বা নদীর মাধ্যমে অস্বাভাবিক জোয়ারের পানি দ্বারা বসতবাড়িসহ ক্ষেতখামার প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হয়ে থাকে। উপকূলীয় এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বসতবাড়িগুলোতে গাছপালার আচ্ছাদন একবারেই কম আবার শাকসবজির চাষাবাদও কম হয়ে থাকে।

নির্বাচিত উপকূলীয় এলাকার বর্ণনা ও বসতবাড়ির অবস্থা

বাংলাদেশের উপকূলীয় বসতবাড়ীতে কৃষি-বন প্রাকটিসের মাধ্যমে এ এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং বসতবাড়িগুলির ভেজিটেশন বৃদ্ধি করার জন্য দেশের মধ্য উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলের ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কুকরী-মুকরীর দুইটি এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলার ১টি গ্রাম সহ মোট ৩ টি গ্রামের ৬২ টি বসতবাড়িতে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। নির্বাচিত গবেষণা এলাকায় কোনো বেড়িবাঁধ ছিলনা এবং বসতবাড়িগুলো নতুন ছিল। গবেষণার প্রারম্ভে বসতবাড়িগুলোর বয়স মাত্র ৮-১০ বছর ছিল। নির্বাচিত বসতভিটাগুলো বর্ষাকালে জোয়ারের সময় প্লাবিত হতো এবং সাধারণ জোয়ারের সময় বসতবাড়ির (বসতভিটা ছাড়া) চারিদিকে পানি দ্বারা প্লাবিত হতো। এ অঞ্চলে চলাচলের জন্য কোনো রাস্তাঘাট নাই, সুপেয় পানির কোনো বন্দোবস্ত নাই, স্যানিটেশন ব্যবস্থাও খুবই নাজুক। প্রাথামিক মাঠ জরিপ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উক্ত উপকূলীয় এলকার বসতবাড়ীতে গাছপালার আচ্ছাদন খুবই কম ছিল এবং কোনো কোনো বাড়ীতে একেবারেই ছিল না। অন্যদিকে বসতবাড়িগুলোতে কোনো শাক সবজির চাষও ছিলনা।

উপকূলীয় এলাকায় বসতবাড়ীতে কৃষি-বন প্রবর্তন পদ্ধতি

- নির্বাচিত এলাকার বসতবাড়িগুলো যেহেত জোয়ারের পানি দ্বারা বর্ষাকালে প্লাবিত হয়ে থাকে তাই এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য বাড়ীর আয়তন, অবস্থা এবং জমির পরিমাণ অনুসারে প্রতিটি বসতবাড়ীর চৌহদ্দির বাহিরে ১০ থেকে ১৫ মিটার লম্বা, ২ মিটার প্রস্থ এবং ০.৫ মিটার থেকে ১ মিটার উঁচু মাটির ঢিবি তৈরী করা হয়।

- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ ও বসতবাড়ির মালিক উভয়পক্ষ যৌথভাবে মাটির ঢিবিগুলো প্রস্তুত করে।
- এ অঞ্চলের বসতবাড়িগুলোতে কৃষি-বন প্রাকটিসের মাধ্যমে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং ভেজিটেশন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুতকৃত মাটির ঢিবিতে এবং বসতবাড়ির উঁচু স্থানে ১১ প্রজাতির ফলদ্ বৃক্ষের চারা সহ মোট ১৯ প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় এবং পাশাপাশি প্রায় ৮-১০ প্রকারের মৌসুমী শাক সবজির আবাদ করা হয়।
- কাঠ জাতীয় ও ফলদ্ বৃক্ষের চারা পলিব্যাগে উত্তোলন করা হয়।
- ফলদ্ বৃক্ষ যথা নারিকেল, সুপারি, উন্নত জাতের আম, কাঁঠাল, উন্নত জাতের কুল যেমন আপেল কুল, বাউ কুল, আমড়া, উন্নত জাতের পেঁয়ারা, কালো জাম, তেঁতুল, কামরাঙ্গা এবং জাম্বুরা এবং কাঠ জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে মেহগণি, রেইন ট্রি, কালো কড়ই, সাদা কড়ই, নিম, জারুল এবং আকাশমনির চারা রোপণ করা হয়।
- তাছাড়া বসতবাড়ির নিচু জায়গায়, খালের পাড়ে গোলপাতা, সুন্দরী ও পশুরের চারা লাগানো হয়।
- গবেষণাটি ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

- উপকূলীয় এলাকার বিরূপ পরিবেশে বনায়ন সফল করতে কঠোর সতর্কতার সাথে ৪/৫ বছর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য।
- চারাগাছের ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসূমে এবং সবজির ক্ষেতে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার ও পানি দেয়া অত্যাবশ্যক। আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফলের ও বৃক্ষের চারা রোপণের ১ম বছরে ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা ও ডালপালা পরিস্কার করতে হবে।
- গৃহপালিত গবাদিপশু বা বন্যপ্রাণীরা বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন মোতাবেক বাগান এলাকার চারিপাশে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে। চারার উঁচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে।
- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়। তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে বর্ষা মৌসুমে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে গাছে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

গবেষণার ফলাফল

- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, গবেষণার প্রারম্ভে বাড়ী প্রতি গড় গাছের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ টি সেখানে ২০১৫ সালে বাড়িপ্রতি গড় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮ টি হয়েছে।
- বসতবাড়ির ঢিবি ও উঁচুস্থানে রোপিত বনজ চারার মধ্যে রেইন ট্রি, মেহগনি, আকাশমনি, নিম এবং কালো কড়ই এর বেঁচে থাকার হার আশাব্যঞ্জক।
- অপরদিকে ফল জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল, পেয়ারা এবং তেঁতুলের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক।

- তাছাড়া প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই গবেষণার চতুর্থ বছরে নারিকেল, কুল এবং পেয়ারার উৎপাদন শুরু হয়েছে।
- শাক সবজি চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গবেষণার ১ম বছরে অর্থাৎ ২০০৮ সালে বাড়িপ্রতি ১৮ কেজি শাক সবজি উৎপাদন হয়েছে যার স্থানীয় বাজার মূল্য মাত্র ১২২ টাকা কিন্তু শেষ বছরে অর্থাৎ ২০১২ সালে বাড়িপ্রতি শাক সবজি উৎপাদন হয়েছে ৪০৬ কেজি যার বাজার মূল্য ৪৪৫৮ টাকা।
- সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো দেখা যায় যে, গবেষণার ১ম বছরে উৎপাদিত শাক সবজির বাড়িপ্রতি প্রায় ১৪ কেজি নিজেদের চাহিদা মিটিয়েছে এবং মাত্র ৪ কেজি বিক্রি করে গড়ে ২৮ টাকা বাড়তি আয় করতে পেরেছে। কিন্তু শেষ বছরে বাড়িপ্রতি ১৮৩ কেজি শাক সবজি নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত ২২৩ কেজি বিক্রি করে গড়ে ২৪৫১ টাকা করে আয় করতে পেরেছে। এভাবে তারা নিজেদের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত শাক সবজি বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসতবাড়িগুলোতে এই পদ্ধতিতে কৃষি-বন প্রবর্তন করলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছপালার আধিক্য ও পুষ্টির অভাব মেটানো সম্ভব। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব।

ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরির বাবুগঞ্জে বসতভিটায় সবজি চাষ

ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরির আমিনপুরে বসতভিটায় সবজি চাষ

পটুয়াখালীর জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলার চর নজিরে বসতভিটায় ফলের গাছ

পটুয়াখালীর জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলার চর নজিরে বসতভিটায় সবজি চাষ